রাণী রাসমণি

প্রদ্যোত গুপ্ত

চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোম্পানী
১২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :—
শ্রীপরেশ চক্রবর্ত্তী
১২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মূল্য দুই টাকা

মুদ্রাকর :—
শ্রীপ্রফুল্লকুমার বক্সী
নিউ প্রিন্টার্স
২০৯সি বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

লেখকের অন্যান্য জীবনী গ্রন্থ ঃ

* নিবেদিতা
* সারদামণি
* বিবেকানন্দ
* রামকৃষ্ণ



রাণী রাসমণি

প্রথম অধ্যায়

আজ থেকে এক শতাব্দীরও বেশী পিছিয়ে চলুন। কোম্পানির মানদণ্ড তখন সবে মাত্র রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়েছে। দেশের অবস্থা তখনও অশান্ত! একদিকে কোম্পানির দম্ভ আর একদিকে রাজা জমিদারের অত্যাচার। শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরাজী ভাবাপন্ন!—দরিদ্র আরো দরিদ্র হতে চলেছে—নতুন বড়লোক দেখা দিচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর অভিজাত শ্রেণীর মূল পত্তন হচ্ছে। কলকাতা তখন তার বর্ত্তমান রূপের স্বপ্নও দেখেনি। যেমন করে নতুন কলোনী গড়ে ওঠে তেমনি করেই কলকাতা গড়ে উঠছে। বন জঙ্গল কেটে লোক-বসতি স্থাপন করছে। তখনও কলকাতার গায়ে আধুনিক পল্লীগুলির নামাবলী পড়েনি। সেই পুরানো নামাবলী গায়ে দিয়েই আছে।

কলকাতা থেকে দূরে একটি ছোট্ট গাঁ—নাম কোনা। এখনকার পল্লী দেখে সে পল্লীর কোন আঁচ পাওয়া যাবে না! ছোট পল্লী। চাষী কৈবর্ত্ত আর কিছু বামুন কায়েতের বাস। গাঁয়ের পাশ দিয়ে মা গঙ্গা কুল কুল করে বয়ে যান।

কোনা গাঁয়ের চারপাশে আছে হালি সহর, নৈহাটী, কাঁচরাপাড়া,

জোঠ, মালঞ্চ, বিজনে হুগলী, বংশবাটী, বালি—আরো ছোট বড় কত পল্লী। এদের কাছে কোনা সত্যি কোনা, এক কোনাতেই পড়ে থাকে।

এই কোনা গাঁয়ে ছিল গরীব চাষী হরেকৃষ্ণ দাসের বাড়ি।

গরীব চাষী বলতে সত্যিই গরীব চাষী। কিন্তু মানুষটি খাঁটি। কোন ছল চাতুরিতে নাই। একেবারে নিখাদ খাঁটি। এখনের মত তখনও খাঁটি মানুষের কপাল একই রকম ছিল। সাংসারিক স্বচ্ছলতার মুখ তাঁরা দেখতেন না। কিন্তু তাতে কি? তাঁদের অন্তরের ঐশ্বর্য্যে তাঁরা ঐশ্বর্য্যশালী—সাংসারিক ভোগ বিলাস তাঁদের লুব্ধ করতে পারে না।

হরেকৃষ্ণ দাসের সংসার খুব বড় নয়। একটি মেয়ে, দুটি ছেলে, দিদি ক্ষেমংকরী আর নিজে—স্ত্রী রামপ্রিয়া বেঁচে নাই। কোন রকমে দিন চলে যায়। রাজা রাজড়ার ঘর নয়, মোটা ভাত আর নুন হলেই খুশি।

হরেকৃষ্ণের মেয়েটি বড় সুলক্ষণা।—যেমন লক্ষ্মীর মত চেহারা তেমনই লক্ষ্মীশ্রী। সুন্দর তো অনেকেই থাকে, কিন্তু সুলক্ষণ সকলের থাকে না। মেয়েটিকে দেখলেই দু'দণ্ড তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। যাত্রাপথে মেয়েটিকে দেখে গেলে কাজ সফল হয়। এমনি পয়মন্ত মেয়ে।

১২০০ সালের আশ্বিন মাসের এগার তারিখ। সে-দিন হরেকৃষ্ণের প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। রূপ দেখে মা ডাকেন রাণী—নাম হলো রাসমণি।

জীর্ণ খড়ের ঘর মেয়ের রূপে আলো। মেয়ে মা বাবার চোখের মণি। কোনা গাঁয়ের সকলের আদরের।

গাঁয়ের সমবয়সি সব মেয়েরা রাণীর খেলার সাথী। কখন পুতুল খেলে, কখন বা লুকোচুরি, কখন বা গাছের ডালে দোলনা ঝুলিয়ে দল বেঁধে সব ঝুল খায়।

বৈশাখ মাস।

নিস্তব্ধ পাড়ায় কেউ বা বিশ্রাম করছে, কেউ বা ঘরে বসে কাজ করছে। আম বাগানের ঘন ছায়ায় ঘুম পালান বাচ্চাদের মেলা বসেছে।

রাণীও সমবয়সীদের সঙ্গে আছে। আম গাছের মোটা ডালে দড়ি বেঁধে দোলনা তৈরী হয়েছে। প্রাণভরে দোল খেয়ে একটা ডুমুর গাছের নীচে ঘনছায়া দেখে সবাই এসে বসল। ফলন্ত ডুমুর গাছে হলদে হলদে ফলের থোকা। গাছের নিচেও অনেক ছড়িয়ে আছে। একটা ছোট পাখী গাছের মাথায় বসে শিষ দিচ্ছে। রাণী উপর দিকে তাকিয়ে পাখিটার খোঁজ করছে। কোন পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে শিষ দিচ্ছে কে জানে। রাণীর চোখ গাছের ডালে ডালে পাতার ফাঁকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। হঠাৎ এক গোছা ডুমুরের মধ্যে একটি ডুমুর ফুল ফুটতে দেখে রাণী পাখির কথা ভুলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।—ভারি মজাতো—ডুমুরের ফুল! তাও আবার চোখের উপরে ফুটল!

রাণী বাড়ি ফিরে মা'কে বলল,—মা আমি আজ ডুমুরের ফুল ফুটতে দেখেছি!

মা জানে মেয়ে মিথ্যে কথা বলে না।

—তাই নাকি! মা বললেন, তুমি তাহলে সত্যি রাণী হবে। যে ডুমুরের ফুল ফুটতে দেখে,—সে স্বাতীনক্ষত্রের জল পায়; যার ঘুমিয়ে থাকা মাথার উপরে সাপ ফনা ধরে রোদ আটকায়, সে মেয়ে হলে রাণী হয়—ছেলে হলে রাজা হয়।

রাণীর রূপটিও যেমন মিষ্টি মনটিও তেমন নরম।

খেলার সাথী সইয়ের বড় অসুখ। বাঁচবার সম্ভাবনা নাই। রাণী দিনরাত সইয়ের মাথার কাছে। একমনে ভগবানকে ডাকে, ঠাকুর সইকে ভাল করে দাও তার বদলে আমাকে নাও।

সেদিন সইয়ের অবস্থা খুব খারাপ। রাণীর মনও খারাপ। এক মনে ভগবানকে ডাকছে, ঠাকুর সইকে ভাল করে দাও আমাকে নাও।

শেষরাত্রের দিকে রাণী স্বপ্নে দেখলেন সই ভাল হয়েছে।

ভোরে সবাই অবাক। একি! মেয়ের গায়ে জ্বর নাই, অসুখের গ্লানি নাই, স্বাভাবিক।

•

পিসি ক্ষেমংকরী কড়া ধাতের মানুষ। মেয়ে-সন্তান যেখানেই থাক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতে হবে। না হলে ক্ষেমংকরীর কাছে ক্ষমা নাই। মা-মরা মেয়ে, তাকে বিশেষ কিচ্ছু না বললেও সঙ্গে যারা থাকত তাদের বেশ করে ত্বু'কথা শুনিয়ে দিত।

বৃন্দাবন ঘোষের মেয়ে তরুলতার সঙ্গে রাণীর খুব ভাব। যেখানেই যায় ত্বু'জন এক সঙ্গে যায়। তরুলতার কাজে সঙ্গে থাকে রাণী, রাণীর কাজে তরুলতা। একদিন খেলতে খেলতে সন্ধ্যা উৎরে গেল।

বাড়ীর দরজায় ক্ষেমংকরী দাঁড়িয়ে। রাণীকে পৌঁছে দিয়ে তরুলতা চলে যাচ্ছিল। ক্ষেমংকরী ডাকলেন, শোন।

তরুলতা ফিরে এলো—আমাকে ডাকছেন ?

—হ্যাঁ। ক্ষেমংকরী বললেন। সন্ধ্যা উৎরে গেছে কতক্ষণ, এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

খেলছিলাম পিসিমা, তরুলতা বলল—আজ খেলতে খেলতে একটু দূরে গিয়ে ফিরতে দেরি হলো।

—মেয়ে সন্তান এত রাত করে ফেরা কি ভাল ? ক্ষেমংকরী বললেন—তুমি আর রাণীর সঙ্গে খেলতে এসো না। বুঝলে ? আমরা গরীব, আমাদের মেয়েদের এত ধিঙ্গীপনা সহ্য হবে না। তুমি বাছা আমাদের বাড়ীতে আর এসো না।

তরুলতা মুখ নিচু করে—ফেটেপড়া চোখের জল আটকাতে আটকাতে বাড়ি চলে গেল।

এমনি করে দিন চলে। রাণী এখন শুধু খেলাই করে না, পাকা গিন্নীর মত সব কাজ বেশ পরিপাটি করে গুছিয়ে করে। রান্নাকরা, ছোটভাইদের খেতে দেওয়া, বাসন মাজা, ঘর ঝাড় দেয়া, বাবার কাজ

—কিছুই সে বাকি রাখে না। বাবা খেয়ে উঠলে কচি গাল ফুলিয়ে কল্কিতে ফুঁ দিয়ে টিকে ধরাতে ধরাতে এনে বাবার হাতে হুঁকোটি তুলে দেয়।

হরেকৃষ্ণ তামাক খান আর মেয়েকে দেখেন। সোনার প্রতিমা মেয়ে—মা নেই, যত্নের দিকে বাবার তাই এত নজর।

কোন সমস্যা দেখা দিলে এক এক সময় রাণী এমন সুন্দর করে মীমাংসা করে দেয় যে হরেকৃষ্ণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

ভিখারি এলে রাণী ফিরিয়ে দেয় না। ক্ষেমংকরী নিজেদের অবস্থার কথা চিন্তা করে যদি কিছু বলে রাণীর মুখ ভার হয়। প্রাণ কাঁদে, মা মরা মেয়ে—ক্ষেমংকরী আদর করে কোলে টেনে নিয়ে কথা ঘুরিয়ে নেয়।

রাণীর ছোট ভাই ছুটি, রাম আর গোবিন্দ দিদির বড় ভক্ত। দিদির সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

বাবার স্নেহে পিসির আদরে রাণী আনন্দে দিন কাটায়। তখনও দেশে এত বিলাসিতার আমদানি হয়নি। মোটা ভাত কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকে। পালা পার্ব্বণে উৎসব করে। যাত্রা, পাঁচালী শোনে। যেমন জীবনের গতি সরল মনগুলিও সরল। মানুষ তখনও কল হয়ে দাঁড়ায়নি। কলকারখানার যুগের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। বিংশ শতাব্দীর যন্ত্র দানব মানুষের শান্তির বিনিময়ে সুখের প্রলোভন নিয়ে এগিয়ে আসছে। বড় বড় সহরগুলিতে উঁকি মারছে। পল্লীগ্রামের শান্ত আকাশে তার ছোঁয়া লাগেনি। কোনা গাঁয়েও লাগেনি। কোনাগাঁয়ের মানুষেরা তাদের গ্রাম্য রীতি নীতি, আচার নিষ্ঠা, সমাজ নিয়ে দিন কাটায়। হয়ত কখন কখন কেউ সহর ফেরতা এসে কিছু নতুন কথা শোনায়, সবাই অবাক হয়ে শোনে। যেমন অন্য পাঁচটা গল্প শোনে তেমনি। তারপর ভুলে যায়। কিন্তু সাদা চামড়া আর কটা চুল সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের বড় ভয়। এ ভয় তখন শুধু কোনা গাঁয়ের লোকেদেরই নয়, গোটা ভারতবর্ষে তখন এই জুজুর ভয় বেশ

করে শিকড় গেড়েছে।

রাণীও সব শোনে। শিশু মন কিছু বোঝে, কিছু বোঝে না। লাল চুল আর সাদা চামড়ার গল্প শোনে। কিন্তু জুজুর ভয়ে জড়সড় হয় না। রাণীর যেমন সাহস, তেমন তেজ, তেমন দয়া মায়া, তেমনি রূপের প্রভা, তেমনি সুলক্ষণা। যেন রূপকথার রাজকুমারী! যেন বিধাতা সব ভাল জিনিষগুলি দিয়ে মেয়েটিকে গড়েছেন।

মেয়ে একটু একটু করে বড় হয়। হরেকৃষ্ণ দাসের উদ্বেগ নাই। রাণীর মা বলে গেছেন মেয়ে রাজরাণী হবে। সতী স্ত্রীর মুখের কথা—হরেকৃষ্ণ নিশ্চিন্ত। মেয়ের বিয়ের জন্য চিন্তা করে না।

রাণী এক দুই করে এগার বৎসরে পা দিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা দেশে চলেছে বর্গীর হাঙ্গামা।—এমন হাঙ্গামা যে মায়েরা শিশুদের জুজুর ভয় দেখান, বর্গী এলো দেশে।—ঝড়ের মত এসে বর্গীরা লুটপাট করে চলে যায়। নগর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে শ্মশান করে দেয়। ছেলে বুড়ো মেয়ে কেউ রেহাই পায় না ওদের হাতে।—সামনা সামনি যুদ্ধের সাহস নাই। হঠাৎ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে হঠাৎ চলে যায়। মগ, ফিরিঙ্গিদের অত্যাচারে একবার বাংলা শ্মশান হয়ে ছিল, বাংলার বুকে আবার নেমে এলো শ্মশানের বিভীষিকা। তার উপরে আছে দেশের রাজশক্তির পীড়ন, জমিদারের অত্যাচার, ষড়যন্ত্র, ডাকাত, ঠ্যাঙ্গাড়ের প্রাধান্য। জোর যার মুল্লুক তার।—মানুষের প্রাণের মূল্য যেন মাটির হাঁড়ির মত তুচ্ছ। গুঁতো দিয়ে ভাঙ্গলেই হয়।

এরই মধ্যে লোকেরা যেন একটু শান্তি পায়, ইংরাজের জমিদারি সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতায়। একটু নিশ্চিন্ত থাকে—কিছুটা বাঁধন আছে এখানে।—একেবারে বানের জলে ভেসে আসার মত নয়। সুশাসন না থাক শাসন আছে। বল্গা ছাড়া নয়।—শোষণ আছে কিন্তু পেষণ তত নাই।

নতুন বসতি—ইংরাজেরা সবাইকেই আদর করে ডেকে নেয়। নিজের কারবারে কাজ দেয়। নবাবের সিপাই কিম্বা বর্গীর দল হুড়মুড় করে এসে ঘাড়ে পড়ে না। জমিদারের পাইক এসে ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় না।—একেবারে যে কিছুই হয় না, তা নয়।—সে সব ছোটখাট অত্যাচার, গরীবের অদৃষ্ট-লিপি, চির কালের সাথী—ওগুলো হচ্ছে যে সমুদ্র দেখেছে তার কাছে নদীর মত।

হাওড়া জেলার ঘোষালপুর। খুব বড় না হলেও গ্রামটি একেবারে

ছোট নয়।—ইংরাজের জমিদারির বাইরে। নবাবের এলাকা।—বর্ষায় জল কাদা, শীতে কুয়াসা, গরমে জ্বলুনি নিয়ে হাসি কান্নায় গ্রামবাসীদের জীবন কেটে যায়।—অন্য পাঁচটা গাঁয়ের মত দলাদলি আছে, উৎসব অনুষ্ঠান আছে, অকাল মৃত্যু আছে আর আছে সংস্কার।—গ্রামবাসীদের অভ্যস্ত জীবন। কিন্তু বিপদ নিয়ে আসে লুটেরার দল, বর্গী, পাঠান, নবাবের দল ছাড়া সৈন্যরা। প্রীতিরাম দাস এ গাঁয়ের ছেলে।—পিসি বিন্দুবালার বিয়ে হয়েছে কলকাতায় মান্নাবাবুদের বাড়িতে।—আমরা এখন বলি কলকাতা—তখন বলত গড় গোবিন্দপুর।

গড় গোবিন্দপুরে মান্নাবাবুদের প্রকাণ্ড বাড়ি।—সে বাড়ির চিহ্ন আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।—Fort William-য়ের ভিতের নিচে পড়ে আছে। গড় গোবিন্দপুরের বেশীর ভাগ দখল করেছে গড়ের মাঠ।

বিন্দুবালা থাকে জানবাজারে। এখন যেখানে সুরেশ ব্যানার্জি রোড তখন সেখানে ছিল জানবাজার।—এখন পর্যন্তও মাঝে মাঝে পুরানো লোকের মুখে জানবাজারের নাম শোনা যায়।

বিন্দুবালা ভাইপোদের নিজের কাছে আনিয়ে রাখলেন।—দেশের যে অবস্থা কখন কার ধড় থেকে মুণ্ডু কে কেটে নামাবে ঠিক কি? কালবৈশাখির ঝড়ের মত কোন লুটেরা দল বেঁধে এসে তচনচ করে দিয়ে যাবে কে জানে।—বিন্দুবালা ভাইপোদের নিয়ে এলেন।

প্রীতিরাম দাস ছোট দু'ভাইকে নিয়ে পিসির কাছে চলে এলো।

মান্নাবাবুদের অক্রুর বাবু ছিলেন ডানকিন সাহেবের দেওয়ান। ডানকিন সাহেবের বিরাট কারবার। বেলেঘাটায় সাহেবের নুনের গুদাম আছে। অক্রুরবাবু সাহেবকে বলে প্রীতিরামকে বেলেঘাটার নুনের কারবারে মুহুরির কাজে লাগিয়ে দিলেন। বেতন কম হলেও বাটা আছে, উপরি আয় আছে।—বুদ্ধিমান প্রীতিরাম অল্প দিনের মধ্যেই হাতে কিছু টাকা জমিয়ে ফেললেন।

সাহেব মারা গেলে বেলেঘাটার নুনের কারবার বন্ধ হয়ে যায়।—বুদ্ধিমান ও কর্মঠ প্রীতিরাম বেলেঘাটাতে এবার নিজেই ব্যবসা আরম্ভ করলেন।—পূর্ব্ব বাংলার এক কায়স্থ মহাজনের সঙ্গে সাহেবের নুনের কারবারে থাকবার সময় প্রীতিরামের আলাপ হয়।—তুজনে মিলে বেলেঘাটায় বাঁশের আড়ত করলেন। বাঁশের আড়তকে তখন সবাই মাড় বলত।—প্রীতিরাম দাস না বলে তাই লোকে বলত প্রীতিরাম মাড়।—বেঙাচির লেজের মত প্রীতিরামের দাস উপাধিটি একদিন খসে গেল—সেখানে মাড় জুড়ে বসল।—প্রীতিরাম নিজেও শেষে অনেক সময় নিজের নাম প্রীতিরাম মাড় বলতেন।

প্রীতিরাম উদ্যোগী পুরুষ। বাঁশের ব্যবসা নিয়েই চুপ করে থাকতেন না। টালায় চলে যেতেন। তখনকার দিনে জানবাজার থেকে বেলেঘাটা, বেলেঘাটা থেকে টালা বা টালা থেকে জানবাজার আসা-যাওয়া খুব সহজ ছিল না।—বুনো ঝোপ ঠেলে, ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে, জল জঙ্গল ভেদ করে পায়ে চলার সরু পথে, কোথাও বা সড়কে কিম্বা ঘোড়ায় চেপে অথবা পাল্কী কিম্বা গরুর গাড়ি করে যেতে হতো। বড় লোকেরা ঘোড়ার গাড়িতে যেতেন।—প্রীতিরাম টালা থেকে নিলামে মাল কিনে এনে সাহেবদের কাছে চড়া দরে বিক্রি করতেন।—তারপর ক্রমে ক্রমে গোরা বারাকের রসদ যোগানোর কাজটিও ব্যবস্থা করে নিলেন।—ঘোষালপুর গাঁয়ের প্রীতিরাম, পিসি বিন্দুবালার আশ্রিত প্রীতিরাম এখন উঠতি মুখে।—তুহাতে টাকা রোজগার করেন কিন্তু অপব্যয় করেন না।—হিসাব করে চলেন।—নামে হাঁড়ি না ফাটলেও দাতা কর্ণ হয়ে তুহাতে টাকা ওড়ান না।—কোন বদ খেয়াল নাই, একমাত্র খেয়াল কাজ কারবার।

যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এসেছেন।—কলকাতায় কিছুদিন থাকবেন।—এখন কলকাতার পরিচয় Calcutta, সুতানটি আর গোবিন্দপুর কলকাতায় হারিয়ে গেছে।

কলকাতা হচ্ছে গোরাদের দ্বিতীয় লণ্ডন। কাজে অকাজে

সাহেবরা কলকাতায় আসেন।

যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও এসেছেন। মান্নাবাবুদের ভাড়াটে বাড়িতে এসে উঠলেন।

তখন সাহেবের কাছে চাকরির মর্য্যাদা অনেক। লোকে একটা কেওকেটা ভাবে। সাহেব বাড়ির কাজের দাম আছে সমাজের কাছে। মান্নাবাবুদের সুপারিশে সাহেব প্রীতিরামকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।—সুশ্রী, বুদ্ধিমান ও কর্মঠ প্রীতিরাম সাহেবের সুনজরে পড়লেন। কিছুদিন দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে প্রীতিরাম ঢাকায় যান। ঢাকায় কিছুদিন কাজ করে নাটোরের মহারাজা রামকান্ত রায়ের কাছে চাকরি নেন।

মহারাজা রামকান্ত প্রীতিরামকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।—প্রীতিরামের বিবেচনা, বুদ্ধিমত্তা কর্মে নিষ্ঠাই এর কারণ। মহারাজ প্রীতিরামকে এতদূর বিশ্বাস করতেন যে এষ্টেটের দেওয়ানের পদে বসিয়ে দিলেন।

মহারাজ লোক চিনতে ভুল করেননি। প্রীতিরাম অত্যন্ত দক্ষতা ও সতর্কতার সঙ্গে কাজ করে খ্যাতির মুকুট মাথায় তুলে নিলেন। মহারাজ দেওয়ানকে এত বিশ্বাস করতেন যে তাঁর বিবেচনার উপরে কিছু বলতেন না।

প্রীতিরাম ঠিক করলেন আর চাকরি করবেন না।—কাজের অভিজ্ঞতাও হয়েছে, হাতেও কিছু টাকা আছে—এবার যা করবেন স্বাধীন ভাবে করবেন।—একদিন দেওয়ানের কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এলেন।

মান্নাবাবুদের বাড়িতেও প্রীতিরামের একটি বিশিষ্ট আসন হয়ে গিয়েছে।—নাটোর থেকে ফিরে এলে মান্নাবাবুদের পরিবারের যুগল কিশোরবাবু প্রীতিরামের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন।—অনেক মেয়ের বাপের দৃষ্টি তখন প্রীতিরামের উপরে।—যুগোল কিশোরবাবুর অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে প্রীতিরামের ভবিষ্যৎ ধরা পড়েছে, তিনি আর কাল-বিলম্ব না

করে প্রীতিরামকে জামাই করে নিলেন। বিয়েতে যুগোল কিশোরবাবু জামাইকে ষোল বিঘা জমি যৌতুক দিলেন।

পিসির অন্নে মানুষ, ঘোষালপুর গাঁয়ের ছেলে প্রীতিরাম এখন প্রীতিরামবাবু। নিজের জমিতে নিজে বাড়ি তুলে প্রীতিরাম ভাইদের নিয়ে উঠে এলেন। জানবাজারে মাহিষ্য জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠা হলো।

সাতোর পরগণা আর মাকিমপুর তালুক নিলামে উঠল। শিবরাম সান্ন্যাল সেখানকার নায়েব। প্রীতিরামের সঙ্গে বিলক্ষণ সদ্ভাব আছে। প্রীতিরামবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে পরগণা দুটো প্রীতিরামের নামে শিবরাম সান্ন্যাল কিনে নিলেন।

সাতোর পরগণা ছিল লাভের। মকিমপুর পরগণা ছিল নীরস। মকিমপুর পরগণাটি সান্ন্যাল মশাই উনিশ হাজার টাকা নিয়ে প্রীতিরামবাবুর কাছে বিক্রি করে দিলেন।

বছর কয়েক মকিমপুর থেকে প্রীতিরামবাবু কিছুই পাননি। জায়গাটা ছিল অসমতল ও নিচু।—প্রতি বৎসর বন্যায় ডুবে যেতে লাগল। প্রতি বছরই বন্যায় জমিতে পলি পড়ে আর নিচু জমিগুলি জলে ভরে বড় বড় দীঘির মত হয়ে যায়। এমনি করে বছর কয়েক গেল, মকিমপুর অনুর্ব্বর তালুক সব চেয়ে উর্ব্বর হয়ে উঠল। চাষীর লাঙ্গলে মাঠে মাঠে সোনার ফসল ফলতে লাগল।

অল্পদিনের মধ্যেই ধান, মশুর, পাট, আখের প্রচুর উৎপাদনে মকিমপুর হলো সবচেয়ে লাভের পরগণা।

একেই বলে কপাল! একেই বলে ভাগ্য!

সান্ন্যাল মশাই যে পরগণাটি নীরস বলে নিজে রাখেননি সেটিই এখন হলো সব চেয়ে সরস।

এর পর থেকে মা লক্ষ্মী যেন প্রীতিরামবাবুর সংসারে তাঁর ঝাঁপি উজাড় করে ঢেলে দিতে লাগলেন। প্রীতিরামবাবু ধুলি মুঠি ধরেন সোনা হয়। যে কাজে হাত দেন শতগুণ লাভ হয়ে ফিরে আসে।

প্রীতিরামবাবুর দুই ছেলে, হরচন্দ্র ও রাজচন্দ্র। সুখের সংসার। কিন্তু ভরা সুখেও একটু খুঁত লাগল। হরচন্দ্র অকালে মারা গেল। চোখের উপরে ছেলের অকাল মৃত্যু ছাড়া প্রীতিরাম জীবনে আর কোন আঘাত পাননি। তাঁর সুখের জীবন-তরী অনুকূল বাতাসে ভরা পাল তুলে ছুটে চলেছে।

হরচন্দ্র মারা গেলেন। প্রীতিরাম রাজচন্দ্রের বিয়ে দিলেন। রাজচন্দ্রের প্রথম বিয়ে হয় চানক গ্রামে। কিন্তু বিয়ের বছরই রাজচন্দ্রের স্ত্রী বিয়োগ হয়। প্রীতিরাম ছেলের আবার বিয়ে দিলেন। এ বউটিও মারা গেল।

প্রীতিরাম চিন্তিত হলেন। এক ছেলে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেল। এ ছেলেরও স্ত্রী ভাগ্য যে রকম, এই বিষয় সম্পত্তিরই বা কি হবে, আর বংশ রক্ষাই বা কে করে!

প্রীতিরাম আবার ছেলের বিয়ে দেবার জন্য উদ্যোগ করতে লাগলেন। কিন্তু একটু ধীরে সুস্থে, দেখে শুনে। যেখানেই যান চোখ খুলে রাখেন, কান দুটো সজাগ রাখেন। এবার একটি সুলক্ষণা মেয়ে ঘরে আনবেন।

প্রীতিরাম হালিশহরে বেড়াতে গেছেন। একজন সমবয়সী সঙ্গী নিয়ে গঙ্গার ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

একটি ছোট মেয়ে এসে দাঁড়াল। কি কৌতূহল হয়েছে গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে।

অতি সাধাসিধে পোষাক। কিন্তু আগুন কি আবরণে ঢাকা থাকে? মাথা থেকে পা পর্যন্ত অতি সুলক্ষণা মেয়ে। আর রূপ? প্রৌঢ় ভদ্রলোক দু'জন অবাক। এত রূপ কি কোন মানুষের থাকে?

প্রীতিরাম খুশি হয়ে উঠলেন। যা খুঁজে বেড়াচ্ছেন হয়ত ভগবান এবার তা মিলিয়ে দিলেন। এই সুলক্ষণা মেয়ে যে-ঘরে যাবে, মা লক্ষ্মী নিজে এসে সে ঘরে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে থাকবেন।

প্রীতিরাম ভাবলেন, মেয়েটি স্বঘর হলে এ মেয়েকেই কুলের লক্ষ্মী

করে নিয়ে যাবেন। কিন্তু স্বঘর কিনা কে জানে। আশা নিরাশায় তুলতে লাগলেন। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ডাক দিলেন।

মেয়েটি ডাগর চোখে ফিরে তাকাল, নম্র ভঙ্গীতে এসে সামনে দাঁড়াল।

—তুমি কাদের মেয়ে মা ?

—দাসেদের।

দাসেদের! প্রীতিরামবাবুর মন দুলে উঠল। হয়ত বা মেয়েটি স্বঘর। হয়ত তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

—তুমি কি এই গাঁয়ে থাক ?

—পাশের গাঁয়ে—কোনা গাঁ আমাদের বাড়ি।

—তোমার বাবার নাম কি মা ?

—হরেকৃষ্ণ দাস।

—তোমার নাম কি ?

—মা রেখেছেন রাণী—ভাল নাম রাসমণি।

—রাণী।—তা মা, তুমি তো রাণীই বটে। আমাকে নিয়ে যাবে ? তোমাদের বাড়ি যাব।

—বেশ তো! আসুন আমার সঙ্গে। রাণী বলল, কিন্তু আমরা গরীব, আপনাদের তেমন আদর যত্ন করতে পারব না।

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন।

—তাই তো মা!—ভীষণ কথা বলেছ। আদর যত্ন তেমন হবে না!

রাণীও হেসে ফেলে।

বুঝল অতিথি শুধু বাইরেই বড় লোক নয় মনটাও ভাল। বলল, আসুন।

পায়ে হাঁটা সরু পথ। এঁকে বেঁকে চলেছে। কখনও ধান ক্ষেত দিয়ে, কখন বা পুকুর ডোবা পেরিয়ে, কখন বা আম বাগানের মধ্য দিয়ে। আগে চলেছে রাণী তার পিছনে অতিথিরা। যাচ্ছে

আর গল্প করছে। কথায় কথায় রাণীর সংসারের অবস্থা জেনে নিলেন অতিথিরা।

রাণী এসে বাড়ির দরজায় থামল।

—এই আমাদের বাড়ি।

খড়ের ঘর—জীর্ণ, কখন বুঝি ভেঙ্গে পড়ে। হাওয়ায় বুঝি উড়িয়ে নিয়ে যায়। গরীব চাষীর ঘর—সে কথা আর বলে দিতে হয় না।—সংসারের দুরবস্থা যেন চারদিকে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু কি পরিচ্ছন্ন, কি পরিষ্কার। যেন দারিদ্র্যের মলিনতা নাই।

হরেকৃষ্ণ খাতির করে অতিথিদের ঘরে বসালেন। সাধ্যমত আদর আপ্যায়ন করলেন। ভাবলেন হয়ত বা কোন খেয়ালে অথবা হয়ত কোন ব্যবসার খাতিরে এই বড় লোক অতিথিরা তাঁর মত গরীবের ঘরে পায়ের ধূলো দিয়েছেন।

হরেকৃষ্ণ আগন্তুকদের দেখেই বুঝেছেন—আগন্তুকরা ধনবান।

অতিথিরা হরেকৃষ্ণর ব্যবহারে খুশি হলেন। সব পরিচয় তো পাওয়া গেল, কিন্তু যেজন্য আসা সে আসল পরিচয় তো পেতে হবে! প্রীতিরাম কৌশলে কথা পাড়লেন।

—নাঃ, স্বঘর! প্রীতিরামবাবু মনের আনন্দ চেপে রেখে বললেন, আমার একটা প্রার্থনা আছে।

প্রার্থনা! হরেকৃষ্ণ অবাক হলেন, কুণ্ঠিত হলেন। তাঁর মত গরীব লোকের কাছে এঁরা কি প্রার্থনা করবেন!

হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন,—ও কথা বলে আমাকে অপরাধী করবেন না। আদেশ করুন।

প্রীতিরামবাবু বললেন, আপনার মেয়েটিকে আমি চাই। আমার পুত্রবধূ হবে। মা লক্ষ্মীকে আমরা ঘরে নেব।

হরেকৃষ্ণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। একি কথা! এতবড় ধনবান—তাঁর মত গরীবের সঙ্গে কাজ করতে চায়!

আরো অবাক হলেন হরেকৃষ্ণ।

প্রীতিরামের সঙ্গী ভদ্রলোক বললেন,—কলকাতার জানবাজারের কথা আপনি নিশ্চয় শুনেছেন। প্রীতিরাম মাড়ের নামও নিশ্চয় শুনেছেন। তাঁর এখন একটিমাত্র ছেলে। ছেলেটির দু'বার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু দুবারই কয়েক দিনের মধ্যে বৌ মারা যায়। এবার তিনি একটি সুলক্ষণা মেয়ে খুঁজছেন। আপনার মেয়েটির মাথার চুল থেকে পা পর্য্যন্ত সুলক্ষণে ভরা। আপনি অমত করবেন না দাস মশাই। আপনার মেয়ে রাজরাণী হবে।

এযে হরেকৃষ্ণের স্বপ্নের বাইরে, তাঁর মা-মরা রাসুর এত সৌভাগ্য! আজ যদি রাসুর মা রামপ্রিয়া বেঁচে থাকত!—হরেকৃষ্ণ চোখের জল চেপে বলল,—আমি কি করে আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা করব!—আমার সে সাধ্য কোথায়?

প্রীতিরামবাবু মহাশয় ব্যক্তি।—হাত নেড়ে বললেন,—ওসব আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।—শুধু একটি সুপারি দিয়ে আপনি মেয়ে দান করবেন।

রাজচন্দ্রের সংসারে আর আসক্তি নাই।—পর পর দু'বার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে।—কে জানে হয়ত বা আবার সেই আঘাত পেতে হবে।—রাজচন্দ্র মাঝে মাঝে নৌকো করে গঙ্গায় বেড়াতে যান।—কখনও বা ত্রিবেণীতে নৌকো করে গঙ্গাস্নান করতে যান।

বিয়েতে ছেলের মন নাই।—প্রীতিরামবাবু একটু হাসলেন।—সামান্য অবস্থা থেকে এত বড় হয়েছেন। তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি রাখেন। কোথায় কখন কি করতে হয় সব নখাগ্রে।

রাজচন্দ্র যাচ্ছেন ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নানে, সঙ্গে আছে সঙ্গীরা।—গঙ্গার কূল ঘেঁসে নৌকো চলেছে।—আর একটু গেলেই পড়বে কোনা গাঁ।—গঙ্গার ধারে রাণী কাজে এসেছে।—রাজচন্দ্রের নৌকা যাচ্ছে সেখান দিয়ে।—সঙ্গীরা দেখিয়ে দিল।—রাজচন্দ্র দেখলেন।

প্রীতিরামের জয় হলো।—রাজচন্দ্রের বিয়েতে অমত নাই শুনলেন।

জানবাজারে মাড়েদের বাড়িতে আবার বিয়ের শানাই বেজে উঠল।—প্রীতিরামবাবু যেন এবার নিশ্চিন্ত।—বংশ লোপের দুশ্চিন্তা থেকেও ছেলের জন্য চিন্তিত ছিলেন বেশী।—শেষে কি বিবাগী হয়ে যাবে নাকি?

এবার যে বাঁধন পড়ল সে বাঁধন ছাড়িয়ে যেতে পারবে না রাজচন্দ্র কখনও।

১২২১ সালের ৮ই বৈশাখ—

কলকাতায় গোয়ালাটুলির একটি ঘরে উঠলেন হরেকৃষ্ণ মেয়েকে নিয়ে।—মনে আনন্দের বান ডেকেছে। মা-মরা রাসু হবে রাজরাণী।—এ আনন্দের মধ্যে হরেকৃষ্ণ মাঝে মাঝে বিমনা হয়ে যান। আহা! যদি রাসুর মা আজ বেঁচে থাকতেন। তাঁর রাণী সত্যিই আজ রাজরাণী হতে চলেছে—সতীলক্ষ্মীর কথা বিফলে যায় না—রামপ্রিয়ার কথা হরেকৃষ্ণের মনে পড়ে।

শুভদিনে শুভক্ষণে রাসমণিকে সোনায় মুড়ে প্রীতিরাম ঘরে আনলেন।—কোথায় সেই কোনার ভাঙ্গা কুঁড়ে—গণ্ডগ্রামের নিরালা কোন—আর কোথায় জানবাজারের চকমিলান সাতমহলা বাড়ি—কোলাহল মুখর কলকাতা! রাণী—বাবার রাসু, মায়ের রাণী তাঁদের কোল ছেড়ে এলেন নিজের সংসারে।—এগার বছরের ছোট মেয়ে বউ হয়ে মাড়েদের বাড়ি এলো।—এলো ভবিষ্যতের রাণীরাসমণি—বাবার রাসমণি আর মায়ের রাণী।

তৃতীয় অধ্যায়

এ যেন রাজযোটক। যেমন রাণী তেমন রাজচন্দ্র। এতবড় ঘরের বউ হয়েছে, ভাঙ্গা কুঁড়ে থেকে সোনার দালানে এসেছে, কিন্তু কোন বিকার নাই।—যেমন বুদ্ধি, তেমন ধর্মে মতি, তেমন সহ্যগুণ।—সেবা ? হ্যাঁ, সে দেখবার মত।—ঝি, চাকর, ঠাকুর, দারোয়ান কিছুরই অভাব নাই।—কিন্তু রাসমণি সব করেন নিজ হাতে। স্বামী, শশুর, শাশুড়ী, গুরুজন আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই নতুন বৌ বলতে অজ্ঞান।

সংসারের কাজ বল, দেব সেবা বল, আদর আপ্যায়ন বল, যত্ন আত্তি বল নতুন বউ না হলে কারো মন উঠে না।—আর নতুন বৌটিও তেমনি, এ সবই তার করা চাই।

শশুর শাশুড়ী সাক্ষাৎ দেবতা। বিয়ের আগে ছিলেন বাবা মা।—এখন বাবা মা দান করে দিয়েছেন, পাত্রান্তর করেছেন।—স্বামী দেবতা, কিন্তু দেবতার যাঁরা দেবতা ? যাঁদের জন্য স্বামী পেয়েছেন ? রাসমণি প্রতিদিন তাঁদের পায়ের ধূলো মাথায় নিতেন। প্রণাম না করে জলস্পর্শ করতেন না।—এমনি লক্ষ্মী বউ যে সংসারে থাকে, সে সংসারে লক্ষ্মী বাঁধা পড়েন, শান্তি বাসা বেঁধে আনন্দ-নিকেতন হয়ে ওঠে।

সকালে উঠেই রাসমণি সংসারের কাজে লেগে যান। সারা দিনেও অবসর নাই।—কিন্তু কেউ তাঁকে করতে বলে না।—বলুক না বলুক নিজের সংসার যে।—শত দাসদাসী থাকলেই বা কি !—

ভোরে উঠে ফুল তোলেন, মন্দিরে কাজ ও ঠাকুর পূজো সেরে তারপর রান্নাঘরে।—রান্নার সব কাজ নিজের দেখা চাই। নিজের হাতে কিছু না কিছু রান্না করা চাই। শ্বশুর শাশুড়ীর পাতে দিতে না পারলে মনে তৃপ্তি হয় না। তাঁরা বারণ করেন। কিন্তু রাসমণি থাকতে পারেন না।

রোজ পূজা আর জপ করা চাই।—এ তাঁর বাপের বাড়ির শিক্ষা। —হরেকৃষ্ণ গরীব হলেও কিছু কিছু লেখাপড়া জানতেন।—খাঁটি মানুষ ছিলেন। যেমন ছিল ধর্মে মতি তেমন ছিল পরের উপকারের নেশা।

রামপ্রিয়াও ছিলেন স্বামীর মত।—দেবতা ব্রাহ্মণে ছিল অচলা ভক্তি।—তাঁদেরই মেয়ে রাসমণি।

বাবা মা যখন ঠাকুর পূজোয় বসতেন, ছোট রাসমণিও নকল করত। রাত্রিতে হরেকৃষ্ণ কখন রামায়ণ পাঠ করতেন, কখন বা মহাভারত—কখন হতো পুরাণ পাঠ।

রাসমণি এক মনে চুপ করে বসে শুনতেন।—যেন আর সব ভুলে প্রতিটি কথা মনের মধ্যে গেঁথে রাখছেন।—তাই ধর্মজীবনের বাঁধন রাসমণির এত দৃঢ়।—ধনকুবেরের সংসারে এসেও সে বাঁধন একটুও শিথিল হয়নি।—অনুকূল পরিবেশে সে বাঁধন আরো শক্ত হলো।

হরেকৃষ্ণের শিক্ষায় রাসমণির মনের জমি ছিল উর্ব্বর। রাজচন্দ্রের শিক্ষায় এবার ফলে ফুলে ভরে উঠল সে জমি।—নানা গুণ, নানা সৎকাজের ভারে পূর্ণ হতে লাগল রাসমণির মন-কুম্ভ। যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী—দুদিকেই নিক্তির কাঁটা সমান।

রাসমণি যেমন রূপে সরস্বতী, গুণে লক্ষ্মী, রাজচন্দ্রও তেমন মূর্ত্ত পুরুষাকার।—নিরহঙ্কার, বিনয়ী, সদালাপী, বন্ধুবৎসল।

রাজচন্দ্র ধনকুবের কিন্তু ধনের গরব নাই। এ ধনের শতাংশ পেলেও অনেকের মাথা ঠিক থাকে না।

রাজচন্দ্র যেমন দেখতেন জমিদারির কাজ তেমনি চালাতেন ব্যবসা। নিজের অধ্যবসায় ও প্রতিভার জোরে সে সময় বাংলা দেশের ধনীক শ্রেণীর মধ্যে তিনি অন্যতম হয়ে উঠলেন।

সেকালের কলকাতার সম্ভ্রান্ত বড়লোক বলতে যাঁদের বোঝাত তাঁদের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল।

শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ, পাথুরেঘাটার ঠাকুরবংশ, রায় রায়ান গুরুদাস, আন্দুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামচরন রায়, দেওয়ান হৃদয়রাম, জোড়াসাঁকোর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, অক্রুর দত্ত, প্রিন্স দ্বারকানাথ, কালী প্রসন্ন সিংহ, রাজা রাধাকান্ত দেব—সবাই ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু।

শুধু কি তাই? ভারতের বড়লাট বাহাদুরও তাঁর বাগানবাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসতেন। লর্ড অক্ল্যাণ্ডের সঙ্গে ছিল বন্ধুত্ব।

তখন কোম্পানীর রাজত্ব চলছে। ভারতবর্ষের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা কোম্পানি। সেই কোম্পানির একজন অংশীদার হলেন জন বেব। বেব সাহেব শুধু ধনীই নয়, তিনি অভিজাত বংশের লোক। ভারতবর্ষে বেড়াতে এলেন, রাজচন্দ্র বাবুর সঙ্গে আলাপ হলো।

সাধারণ ভদ্রতা ও সৌজন্যের গণ্ডী পার হয়ে আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বেব সাহেব রাজচন্দ্রকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন। সে ঘড়িটি এখনও রাজচন্দ্র বাবুর বংশধরদের কাছে আছে।

সে ঘড়ির গায়ে লেখা আছে—

A Token of Esteem
sent by
John Bebb, Esq of London
To his friend
Babu Raj Chandra Doss
January, 1926.

রাজচন্দ্র কি ব্যবসা কি জমিদারী সংক্রান্ত যে কোন কাজ আরম্ভ করবার আগে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে নিতেন।

ব্যবসা ও অর্থ উপার্জ্জনের কৌশল এবং বুদ্ধি থাকলেও রাজচন্দ্র ছিলেন যেমন সত্যনিষ্ঠ তেমন ধর্ম্মভীরু ও মহৎ।

ব্যবসা তিনি এত ভাল বুঝতেন যে একদিনেই তিনি Exchange-য়ের নীলাম থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা রোজগার করে নেন।

রাজচন্দ্রের আর একটি গুণ ছিল। কথা রাখতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। মরদকা বাত হাতীকা দাঁত—বলতেন, হাতীর দাঁত যেমন একবার বাইরে এলে আর ভিতরে যায় না, মরদের কথাও সেরকম। যেকথা একবার মুখ দিয়ে বেরোবে সে কথা আর কখনও ফিরবে না।

এটা কথায় শুধু নয়, রাজচন্দ্র কাজেও তাই করতেন।

হুক ডেবিডসন এণ্ড কোম্পানী নামে এক সাহেব কোম্পানী ছিল। কোম্পানীটি দেউলিয়া হয়ে যায়। রাজচন্দ্র সেকথা জানতে পেরেও নিজের কথা ফিরিয়ে নেননি। এজন্য একলক্ষ টাকা তাঁর নষ্ট হয়।

এই কোম্পানির মুৎসুদ্দি ছিলেন রাজচন্দ্রের ভগ্নীপতি। তিনি কোম্পানির মালিককে একলক্ষ টাকা ঋণ দেবার জন্য সাহেবের হয়ে রাজচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। রাজচন্দ্র ভগ্নীপতির অনুরোধে টাকা দিতে স্বীকার করেন।

সাহেব যখন টাকা নিতে এলেন, রাজচন্দ্রের মায়ের তখন অন্তিম অবস্থা। সাহেবকে তিনি পরে আসতে বললেন। সাহেব জানাল পরের দিন টাকা না পেলে সাহেবের খুব অসুবিধা হবে। রাজচন্দ্র পরদিনই এসে নিয়ে যেতে বলে দিলেন। সাহেব চলে যেতেই তিনি জানতে পারলেন সাহেব দেউলিয়া হয়েছে। টাকা পেলেই তিনি দেশে ফিরে যাবেন। এ টাকা আর ফিরে পাবার কোন পথ নাই।

এসব জেনেও রাজচন্দ্র নিজের দেয়া কথা থেকে এক চুলও নড়েন নি। পরের দিন সাহেব এলে তাঁকে একলক্ষ টাকা দিয়ে দিলেন।

ভগ্নীপতি রামরতনবাবুকে আক্ষেপ করে একদিন বলেছিলেন, আপনি আমার নিজের লোক হয়ে লোকসান করালেন ?

রামরতনবাবু বললেন—সাহেবের দেউলিয়া হওয়ার কথাতো আপনি জানতেন, দিলেন কেন ?

রাজচন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন—না দিয়ে কি করব ? একবার যে

মুখে দেব বলেছি ; সে মুখে আবার না বলব কি করে ? এরকম করতে তো শিখিনি।

রাজচন্দ্রবাবু স্ত্রীকে যেমন বিশ্বাস করতেন তেমন রাসমণির বুদ্ধির উপরেও তাঁর দৃঢ় আস্থা ছিল।

বহু সৎ কাজ তিনি রাসমণির পরামর্শে করে গেছেন।

গঙ্গাতীরে নিমতলা শ্মশান ঘাট। ঘাটের গা ছুঁয়ে চলেছেন পতীতোদ্ধারিণী গঙ্গা। হিন্দুদের অন্তিম সময়ের একান্ত আকাঙ্ক্ষার স্থান। বহু দূর দূর থেকে মুমূর্ষু অন্তিম যাত্রীদের নিয়ে আসে এই ঘাটে। কিন্তু কোন ব্যবস্থা নাই।

রাসমণি দেখলেন।

স্বামীকে বলে একটি ঘর তুলে দিলেন। যেখানে এসে সকলে বিশ্রাম করবে। এতদিন খোলা আকাশের নিচে—রোদ, বৃষ্টি মাথায় করে বসে থাকত। এবার থেকে সে কষ্টের অবসান হলো।

একজন দারোয়ান, একজন ডাক্তার ও দুটি চাকরের ব্যবস্থাও সে সঙ্গে রাসমণি করে দিলেন। যারা আসবে তাদের দরকার হতে পারে। হয়ত বা কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, কার কখন কি দরকার হয় কে জানে!

রাসমণির সুব্যবস্থায় নিমতলা ঘাটের অসুবিধাগুলি দূর হয়ে গেল।

আহিরীটোলার গঙ্গায় একটি স্নানের ঘাট আছে। বহু স্নানার্থীর ভিড় হয় সে ঘাটে।

ঘাট নামেই ঘাট, জলকাদা ভেঙ্গে স্নান করতে হয়। রোদ বৃষ্টিতে মাথা বাঁচাবার উপায় নাই। স্নানার্থীদের চূড়ান্ত অসুবিধা। তবুও স্নানার্থী আসে। আসবে বই কি—গঙ্গাস্নান কি আর সেজন্য আটকে থাকতে পারে? এতো গেল সাধারণ দিনগুলির কথা—এর উপরে আছে পূজা, পার্বন, বার, ব্রত—তখন চারদিকের মানুষ এসে জমাট বাঁধে। রাসমণির পরামর্শে রাজচন্দ্র মায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য বহু টাকা খরচ করে আহিরীটোলায় ঘাট বানিয়ে দিলেন।

বেলেঘাটায় খাল হবে। সরকার খাল কাটাবেন। কিন্তু জমি তো সব রাজচন্দ্রের।

রাজচন্দ্র সরকারকে জমি দান করলেন। সর্ত্ত হলো, খালের উপরে পুল হলে পারাপারের জন্য কোন মাশুল সরকার নিতে পারবেন না।

রাজচন্দ্রের উদার মনে অন্য কোন সর্ত্তের কথা ওঠেনি। তিনি ইচ্ছা করলে নিজের সুবিধামত কোন ব্যবস্থা করে নিতে পারতেন। কিন্তু রাজচন্দ্র তো সে ধাতুর মানুষ ছিলেন না। লোকের উপকার করতে হলে সে উপকার করতে হয় নিঃস্বার্থ ভাবে—একথা রাজচন্দ্র বিশ্বাস করতেন।

চানক গ্রামে একটা তালপুকুর ছিল। সে পুকুর থেকে গ্রামবাসী জল নিত। পুকুরটির মালিক রাজচন্দ্র নয়। তিনি প্রথম বিয়ে করেন চানকে। সুতরাং তিনি জানতেন যে এ পুকুরটি গ্রামবাসীদের কত প্রয়োজন।

রাজচন্দ্র অন্যের পুকুর জেনেও বহু টাকা খরচ করিয়ে সংস্কার করিয়ে দেন। গ্রামবাসীরা দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ করে।

মেটকাফ হলে সরকারী লাইব্রেরির উন্নতির জন্য দশ হাজার টাকা দান করে রাজচন্দ্র সকলের প্রশংসাভাজন হলেন।

রাজচন্দ্র ছিলেন এমন একজন লোক, যিনি লোকের উপকারের জন্য অর্থ সাহায্যে কখনও কার্পণ্য করতেন না। দানের প্রতিদানও চাইতেন না। দানেই ছিল তাঁর আনন্দ, উপকার করাই ছিল তাঁর নেশা। অর্থ তো অনেকেরই থাকে কিন্তু সৎ ব্যয়ে কজন এগিয়ে আসে? দান তো অনেকেই করে, নিঃস্বার্থ দান ক'জন করে?

এদিক থেকে রাজচন্দ্র ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দী। আবার একাজে উৎসাহ উদ্দীপনার উৎস ছিলেন তাঁর স্ত্রী রাণী রাসমণি।

হরেকৃষ্ণ দাসের মৃত্যু হলো সাল ১২৩০।

রাসমণি চতুর্থী শ্রাদ্ধ করবেন। গঙ্গাতীরে গেলেন বাবার কাজ করতে। কাজ করবেন কি, পাঁক ভরা ঘাট—চারদিকে ছড়িয়ে আছে

ইট পাথর। কাজ করতে বসবেন কোথায়! পা ফেলাই তো যায় না। কিন্তু এরই মধ্যে লোকেরা স্নান করে যাচ্ছে। চূড়ান্ত অসুবিধা, এত অসুবিধা কিন্তু ঘাট কখন নির্জ্জন থাকে না।

রাসমণি কাজ সেরে বাড়িতে এলেন। আসবার পথেই মনস্থির করেছেন, এ ঘাট বাঁধিয়ে দিতে হবে। লোকে যেন হাসিমুখে স্নান করে বাড়ি ফিরে যায়।

স্বামীর কাছে মনের ইচ্ছা জানালেন।

রাজচন্দ্র বাবু গ্যারিশন অফিসারের অনুমতি আনিয়ে বহু অর্থ ব্যয়ে স্নানের ঘাটটি বাঁধিয়ে দিলেন। নাম হল বাবুঘাট।

বাবুঘাট আজও আছে। সামনের রাস্তাটির নাম বাবু রোড। এ রাস্তাটির পত্তনও রাজচন্দ্রের অর্থে হয়।

এখনও বাবুঘাটের পাথরে খোদাই সেই সেদিনকার লেখাগুলি দেখতে পাওয়া যায়—

The Right Honourable Lord William Cavendish Bentinck, G. C. B. G. C. H. Governor General... with a view to encourage the direction of private munificence to works of public utility, has been pleased to determine that this Ghaut constructed in the year 1830 at the expense of Baboo Raj Chandra Doss shall hereafter be called Baboo Raj Chandra Doss's Ghaut.

ছোট বড় বহু সৎকাজে রাজচন্দ্রের দান আছে। সে সবের সঠিক হিসাব কেউ রাখেনি। রাজচন্দ্র নিজেও রাখেননি। তিনি দান করেছেন, কাজ করেছেন কিন্তু তার হিসাব কখনও কষতে বসেননি। কাজের জমার খাতায় শূন্য, খরচের ঘরেও কোন সংখ্যা রাখেননি।

বহু বন্ধু বান্ধব তাঁর কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন। সে টাকা কখন পেয়েছেন, কখন পাননি। কিন্তু কখনও এজন্য তাগিদ দেননি। যেমন

পরিচিত তেমন অপরিচিতকেও রাজচন্দ্র অর্থ সাহায্য করেছেন। তিনি জানতেন যে এ টাকা ফিরিয়ে পাওয়া যাবে না, সে আশাও তিনি করতেন না।

পূরা সুখের সময়। যেমন নাম যশ তেমনি অর্থের সমাগম। দিনগুলি যেন সোনার পাখায় ভর দিয়ে উড়ে চলেছে।

একদিন হঠাৎ এই পরিষ্কার আকাশ ঘিরে কালো মেঘের ছায়া ঘনিয়ে এলো—অপ্রত্যাশিত রূপে, অভাবনীয় রূপে।

রাজচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

একদিন রাজচন্দ্র গাড়ি করে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। রোজই এসময় একবার করে যান—সেদিনও গেছেন।

হঠাৎ যেন বুকের ভিতরে কেমন করে উঠল। তাড়াতাড়ি গাড়ি বাড়ির দিকে ঘুরিয়ে নেবার জন্য ইসারা করলেন। এই মুহূর্ত্ত সময়টুকুই তাঁর জ্ঞান ছিল।—অজ্ঞান হয়ে গদির উপরেই কাৎ হয়ে পড়ে গেলেন।

বাড়ির গাড়ি, পুরানো কোচম্যান। মনিবের অবস্থা দেখে বাড়ির দিকে গাড়ি ঝড়ের মত ছুটিয়ে নিয়ে গেল।

অসময়ে গাড়ি ফিরে আসতে দেখে দারোয়ান অবাক হয়ে তাকায়। রাজচন্দ্রের কাজ ছিল নিয়ম বাঁধা। হঠাৎ ফিরে এলেন, কি ব্যাপার ? শুধু দারোয়ান নয়, অনেকেই ফিরে তাকাল সেদিকে।

গাড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

গাড়ির দরজা খুলে ধরতে যেয়েই কোচম্যান চেঁচিয়ে উঠল। জ্ঞানহারা রাজচন্দ্র পড়ে আছেন গদীর উপরে। বেঁচে আছেন কি না কে জানে। কোচম্যানের ভীত চিৎকারে সকলে ছুটে এলেন।

তারপর চলল যমে মানুষে টানাটানি। কলকাতা সহরের বড় বড় ডাক্তার বৈদ্য এলো, এলো ভিড় করে গণ্যমান্য পরিচিত বন্ধুরা—আর কত অপরিচিত লোকেরা।

বাড়ির সামনে রাজপথের উপরে বিছিয়ে দেওয়া হলো ঘাস খড়—

যান-বাহনের শব্দে যাতে রুগীর অসুবিধা না হয়। যানবাহন-পূর্ণ অতবড় রাজপথে হঠাৎ স্তব্ধতা নেমে এলো। পথচারিও সাবধানে এ পথটুকু অতিক্রম করে—বাবু রাজচন্দ্র অসুস্থ। তাঁর মূল্যবান প্রাণটুকু বাঁচাবার চেষ্টা সকলেরই।

বাড়ির সিঁড়িতে, উপরের মেঝে, আঙ্গিনায়—শতরঞ্চি, গালিচা, সামিয়ানা যেখানে যা ছিল সব বিছিয়ে দেওয়া হলো—যেন কোন শব্দ কানে গিয়ে রুগীর বিরক্তি উৎপাদন না করে। ছেলে, বুড়ো, আগন্তুক যাওয়া আসা করে সাবধানে পা টিপে।—বেড়ালের মত নিঃশব্দে।

রাণী খুলে দিলেন টাকার বাক্স। স্বামীর জন্য যে যা বলে রাণী করে যান। নিজের উপরে মমতা নাই, অর্থের হিসাব রাখেন না—আজ যে তাঁর মহা অনর্থ হতে বসেছে।

কিন্তু সবই বৃথা। কিছুই হলো না। বন্ধু বান্ধবের আকাঙ্খা, ডাক্তার বৈদ্যের চেষ্টা, আত্মীয়স্বজনের যত্ন, স্ত্রীর ঐকান্তিক কামনা সবই বিফলে গেল।

সকলের অশ্রুসজল সান্নিধ্যে তিনি দিব্যধামে চলে গেলেন।

সেই যে জ্ঞান হারিয়েছিলেন, সে জ্ঞান আর ফেরেনি। ১২৪৩ সালে বিয়ের বত্রিশ বছর পরে মাত্র উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে রাজচন্দ্র দেহত্যাগ করেন।

রাণী ভেঙ্গে পড়লেন।

একি মৃত্যু! শেষ কথাও বলে গেলেন না। যাঁর ভাগ্যে ভাগ্য, যাঁর জন্য তিনি আজ রাজরাণী—সেই রাজাই যখন নাই, তখন এদেহে আর কি প্রয়োজন?

রাসমণি ঘরের মেঝেয় পড়ে আছেন। আজ তিন দিন। নীরবে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। দিন রাত কখন হয় কে জানে। রাসমণির চোখের উপরে গভীর অন্ধকার। তিন দিন পড়ে আছেন একই ভাবে, জলস্পর্শও করেননি। জানবাজারের রাজবাড়ি নিস্তব্ধ —শোকের কালো ছায়ায় ঢাকা।

ধীরে ধীরে রাসমণি উঠে বসলেন। স্বামীর অপূর্ণ কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে, যাদের রেখে গেছেন তারা না ভেসে যায়। তাদের দেখতে হবে। এতবড় জমিদারী, এত ব্যবসা—সব কিছুই চালাতে হবে। তিনি কিছু বলে যেতে পারেননি—কোন ব্যবস্থা করে যেতে পারেননি। একটা অমঙ্গলের ঘূর্ণী এসে হঠাৎ তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। রাসমণি উঠে বসলেন।

স্বামীর সব কিছুরই সংবাদ তাঁর জানা। রাজচন্দ্র স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু করতেন না। স্ত্রীকে তিনিই নিজের হাতে তৈরী করে নিয়েছেন।

অশৌচের কাজ শেষ হলো। এবার শ্রাদ্ধের আয়োজন। স্বামীর উপযুক্ত আয়োজন করতে হবে।

গুরুদেব রামসুন্দর চক্রবর্তী আর পুরোহিত উমাচরণ ভট্টাচার্য্য দানসাগর শ্রাদ্ধের তালিকা করলেন। রাণীর হুকুম কোন কৃপণতা নয়—কোন দ্বিধা নয়—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে নিয়ম সে নিয়মে কাজ হবে।

সোনার ষোড়শ হলো, বৃষোৎসর্গ হলো, হলো অধ্যাপক বিদায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দান গ্রহণ করলেন। কত দেশের কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এলেন হিসাব নাই। এক বিরাট ব্যাপার। এরপরে হলো দরিদ্রনারায়ণ সেবা। পঁচিশ ত্রিশ হাজার লোকের সমাবেশ। প্রত্যেকে পেল দুটি করে হাঁড়ি। একটিতে লুচি সন্দেশ অন্যটিতে একটি কাপড় ও আট আনা পয়সা।

তখন এই আট আনা পয়সার মূল্য অনেক। দেশে তখন এক টাকা চালের মন, টাকায় আট সের তেল, ঘি টাকায় দু'সের, গুড়ের মণ এক টাকা, দুধ ষোল সের—সুতরাং আট আনা পয়সা তখন অনেক। সারাদিনরাতেও বিদায়পর্ব্ব শেষ হয়নি ; পরের দিন দুপুর পর্য্যন্ত একাজ চলে।

এরপর রাণী রাসমণি তুলোট করেন। মানে রাণীকে একদিকে বসিয়ে তৌলদণ্ডে রূপার টাকায় রাণীর ওজন ঠিক করা হলো।

৬০১৭ টাকা রাণীর ওজন—এসব টাকা ব্রাহ্মণকে দান করলেন। যখন শেষ লোকটিও চলে গেল, রাণী উঠতে যাবেন একজন সন্ন্যাসী এসে রাণীর সামনে দাঁড়ালেন।

সন্ন্যাসীকে দেখেই রাণী চিনলেন; এই সন্ন্যাসী ঠাকুরই রাজচন্দ্রকে রঘুনাথজি দিয়ে যান।

একদিন দুপুরে রাজচন্দ্র শুয়ে বিশ্রাম করছেন। তখন বৈশাখ মাস। সন্ন্যাসী রাজচন্দ্রের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। রাজচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবেন। দারোয়ানেরা রাজি হলো না। সন্ন্যাসী কথা শুনলেন না, তাঁর ক্রোধ দেখে দারোয়ানেরা রাজচন্দ্রবাবুকে সংবাদ দিলেন। রাজচন্দ্রের দেব দ্বিজে অসাধারণ ভক্তি। তখনি উঠে বৈঠকখানায় এসে সন্ন্যাসীকে ডেকে পাঠালেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুর একটি আধ হাত উঁচু বিষ্ণুমূর্ত্তি রাজচন্দ্রকে দিয়ে বললেন, আমি তীর্থে চলে যাচ্ছি, এই রঘুনাথজি তোমাকে দিয়ে গেলাম। তুমি পূজো করো তোমার মঙ্গল হবে।

বিনিময়ে রাজচন্দ্র কিছু গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। সন্ন্যাসী হেসে বললেন, আমি গরীব ভিখারী না। বলেই সন্ন্যাসী ঠাকুর চলে গেলেন।

সেই থেকে রঘুনাথ এ বাড়িতে আছেন।

রাণী বিনীতভাবে প্রণাম করে সন্ন্যাসীকে কিছু গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। সন্ন্যাসী একটা লোটা ও একটি কম্বল গ্রহণ করলেন।

মন্দিরে যেয়ে রঘুনাথজিকে প্রণাম করে খুশি মনে ফিরে এসে রাণীকে আশীর্ব্বাদ করে গেলেন—ধর্ম্মে তোমার অচলা ভক্তি থাকবে।

চতুর্থ অধ্যায়

রাজচন্দ্র নাই। রেখে গেছেন বিশাল সম্পত্তি, নগদ প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা আর ব্যবসা।

রাণী রাসমণি শক্ত হাতে হাল ধরলেন। রাজচন্দ্রের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন অনেকে ভেবেছিলেন এবার বোধ হয় জানবাজারের মাহিষ্য জমিদার বংশের দুঃসময় ঘনিয়ে এসেছে। তাদের কিছুটা নিশ্চিন্ত ও কিছুটা অবাক করে দিয়ে রাসমণি কয়েক দিনের মধ্যে সুব্যবস্থা করে নিয়ে নিজের কাঁধে সব ভার তুলে নিলেন।

নগদ টাকা ও বিষয় সম্পত্তি ছাড়াও রাজচন্দ্র বন্ধুবান্ধব ও বেঙ্গল ব্যাঙ্ককে যে টাকা ধার দিয়েছিলেন তার পরিমাণও কম নয়। রাণী রাসমণি প্রথমেই সেদিকে মন দিলেন।

এই বিষয় সম্পত্তি চালাবার জন্য রাণী রাসমণিকে সত্যি রাণীগিরি করতে হতো। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সরল, ব্রহ্মচারিণী। জনক ঋষির সঙ্গে তুলনা করতে পারা যায়।

রাণী হলেও রাসমণি নিজের সব কাজ নিজের হাতে করে নিতেন। ভোরে ঘুম থেকে উঠে নিজের করণীয় কাজগুলি শেষ করে পাট কাপড় পরে রঘুনাথজিকে প্রণাম করতে যেতেন। সেখানে বসেই জপ করে নিতেন।

তারপর বৈষয়িক বিষয়ে মন দিতেন। জমিদারী ও ব্যবসার সব কাগজপত্র দেখতেন ও খুঁটিনাটি জেনে নিয়ে নিজের মতামত জানাতেন।

হিসাবপত্র তিনি খুব মনযোগ দিয়ে দেখতেন। স্মরণ শক্তিও ছিল প্রখর। পূর্ব্বের দেখা হিসাবপত্র দরকার হলে তিনি খাতাপত্র না দেখেই মনে করে নিতে পারতেন। কোন কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন হলে তিনি নিজেই নিয়োগ করতেন।

মথুরামোহন ছিলেন উপযুক্ত জামাই। তার উপর নির্ভর করেই রাসমণি কাজ করতেন। মথুরামোহনই সব দেখাশুনা করতেন। রাণী লক্ষ্য রাখতেন ও কাগজপত্রে স্বাক্ষর দিতেন, প্রয়োজনে হুকুমনামা দিতেন।

দুপুর পর্য্যন্ত বৈষয়িক কাজে রাসমণি ব্যস্ত থাকতেন। তারপর ঠাকুরের প্রসাদ খেয়ে বিশ্রাম করতেন। বিকালে আবার বৈষয়িক কাজে বসতেন। তারপর যেতেন মন্দিরে। দেবতার পূজা ও আরতি করতেন।

প্রতি সন্ধ্যায় রামায়ণ, মহাভারত কিম্বা পুরাণ পাঠ অথবা কথকতা হতো। শত কাজের মধ্যেও এসময় কিছুক্ষণের জন্য তিনি এসে বসতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের তিনি অত্যন্ত ভক্তি করতেন। তাঁদের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনাও করতেন।

বিষয়কর্মে রাণীর বুদ্ধি ছিল তুলনাহীন। রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পরে যে টাকাগুলি বাইরে লোকের কাছে ছিল সে টাকা রাণী সবই আদায় করেন বটে, তবে খুব সহজে একাজ হয়নি। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ক্ষুরধার তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করেছে। অনেক সময় এজন্য তাঁকে কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে।

রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পরে একজন বিখ্যাত জমিদার রাণীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। রাজচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিছুক্ষণ আলাপের পরে তিনি বললেন, আপনি ঘরের বউ, এত বিপুল ঐশ্বর্য্য একা আপনার পক্ষে ঠিক রাখা সম্ভব হবে কি? একজন ম্যানেজার রাখা দরকার।

রাসমণি পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জমিদার তাঁর মুখের ভাব দেখতে পেলেন না। রাসমণির মুখে হাসি উঠে মিলিয়ে গেল। এই জমিদার রাজচন্দ্রের কাছ থেকে দু'লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলেন। কিন্তু লিখিত কিছু ছিল না। রাসমণি সে টাকার কথা জানতেন। মথুরানাথকে দিয়ে উত্তর দিলেন, আপনি যা বললেন সে কথার ভুল

নাই। কিন্তু সেরকম বিশ্বাসী লোক কোথায় পাব ? জমিদার বললেন, আমি আপনার ম্যানেজার হলে আপনার সবদিক ঠিক থাকবে।

রাসমণি পর্দ্দার আড়াল থেকে মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, সে তো খুব ভাল কথা। আমি এখনও সব কিছু জানতে পারিনি। তবে আমি জানি আপনি আমার স্বামীর কাছ থেকে দু'লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন, এ সময়ে যদি দিতে পারতেন তবে উপকার হতো।

আচ্ছা ব্যবস্থা করছি। বলে সেদিন জমিদারবাবু চলে গেলেন। পরের দিন এসে বললেন, আমার হাতে এখন নগদ টাকা নাই তার বদলে আমি ঐ টাকার জন্য একখানা তালুক লিখে দিতে পারি।

রাসমণি সম্পত্তিটির বাৎসরিক আয় কত জানতে চাইলেন। বছরে ছত্রিশ হাজার টাকা,—জমিদার বললেন, দাম দুলক্ষ টাকার বেশী।

রাসমণি রাজি হলেন।

জমিদারবাবু তালুকটি রাসমণির নামে লিখে দিলেন।

কিছুদিন পরে জমিদার বাবু আবার এলেন। এসে তাঁকে ম্যানেজার রাখার কি হলো জানতে চাইলেন।

রাসমণি জামাইকে দিয়ে বলে পাঠালেন,—আমি বিধবা, জামাইরা উপযুক্ত—বিষয় আর এমন কি বেশী! আপনার মত সম্ভ্রান্ত লোককে কাজ করতে বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। সামান্য বিষয়—জামাইরা দেখাশুনা করতে পারবে। আপনি আমার স্বামীর বন্ধু, সুতরাং আপনার কাছে আমার দাবী--আপনি এদের সন্তানের মত স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন, মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নেবেন তাহলেই আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

রাসমণির তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে জমিদার বাবুটি হেরে গেলেন। কিন্তু এজন্য তিনি অসন্তুষ্ট হননি—বরং প্রশংসা করেছেন।

প্রজাদের উপকারের জন্য রাসমণি টাকা খরচ করতে একটু চিন্তা করতেন না। বলতেন, ওরা আমার ছেলে, ওদের কষ্ট আমার সহ্য

হয় না। প্রজাদের ধনপ্রাণ রক্ষা করা এবং তাদের দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য রাণী রাসমণি মুক্তহস্ত ছিলেন।

মধুমতী আর নবগঙ্গা দুই দিকে দুই নদী বয়ে যায়। রাসমণি খাল সংস্কার করিয়ে দুই নদী মিলিয়ে দিলেন। নাম হলো টোনার খাল। এই খাল সংস্কারে তাঁর প্রায় লক্ষ টাকার উপরে খরচ হয়ে গেল। রাণী ভ্রূক্ষেপ করলেন না। প্রজাদের চাষের সুবিধা হলো এটাই রাণীর কাছে বড়।

বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য রাসমণিকে অনেক সময় পুরুষোচিত ব্যবহার করতে হয়েছে।

মকিমপুর পরগণা রাণী রাসমণির জমিদারি। নীলকর সাহেবরা এখানে অত্যাচার আরম্ভ করল। হয়ত ভাবলে, একে ভারতীয় তার উপরে মহিলা, সুতরাং তারা যা খুশি করে যেতে পারে। প্রজাদের উপরে অত্যাচারের কথা শুনে রাসমণি পঞ্চাশজন লাঠিয়াল পাইক পাঠিয়ে দিলেন। নিজের হাতে চিঠি দিয়ে নায়েবকে জানালেন—নীলকর সাহেবদের ভয় পাবার দরকার নাই—তাদের যেন উচিতমত শিক্ষা দেওয়া হয়।

সেই নীলকর সাহেবকে আচ্ছা করে উত্তম মধ্যম দিয়ে আধমরা করে ছেড়ে দিয়ে রাণীর পাইকরা ফিরে এল। সাহেব মামলা করলেন। মামলা ডিসমিস হয়ে গেল। নীলকর সাহেবটি স্থান ত্যাগ করাই উচিত বিবেচনা করলেন। মকিমপুরে নীলকরের উৎপাত বন্ধ হলো।

সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছে। দেশব্যাপি অরাজকতা। কোম্পানির সিংহাসন টলমল। রাসমণির হিতৈষীরা রাসমণিকে কোম্পানির কাগজ বিক্রী করে ফেলতে বললেন। কারণ কোম্পানি থাকবে না। সুতরাং পরে এ কাগজেরও কিছু মূল্য থাকবে না। এখন যা কিছু পাওয়া যায়। রাণীর বহু টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল। কাগজের দর তখন খুব পড়ে গেছে। রাসমণি বিক্রি করা

তো দূরের কথা, আরো কোম্পানির কাগজ কম দামে পেয়ে কিনে রাখলেন।

লোকে ভাবল, এবার রাণী বহু টাকা লোকসান দেবেন কিন্তু হলো ঠিক বিপরীত। বিদ্রোহ ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কোম্পানির কাগজের বাজার চড়া দামে উঠল। রাসমণি কম দামে কেনা কাগজগুলি বিক্রি করে প্রচুর টাকা লাভ করেন।

রাসমণি কোনা গাঁয়ে এসেছেন, বাপের বাড়ি। কম করে ত্রিশ বছরতো হবেই—সেই যে এ গাঁ ছেড়ে জানবাজারে শ্বশুর বাড়ি গেছেন তারপর এই এলেন। হরেকৃষ্ণের রাসু এখন রাণী রাসমণি—লোকের মুখে মুখে নাম। রাণী ভবানীর মত কীর্ত্তিমতী।

রাণী এসেছেন বাপের দেশ দেখতে।

এর মধ্যে অবশ্য বার কয়েক ত্রিবেণী গঙ্গাস্নান করে গেছেন। কিন্তু কোনা গাঁয়ে আসা হয়নি। এবার এলেন।

বাবা নাই, পিসি নাই, মাতো আগেই গেছেন, ভাই দুটিকেও নিজের কাছে নিয়ে রেখেছেন—আসবার আর তাড়া কি! ভিটেটুকু শুধু আছে। বছর বছর খাজনা মিটিয়ে দিয়ে রেখে দিয়েছেন, শত হলেও বাপের ভিটে তো। নাই থাকল কেউ তবু সে মাটির দাম কত!

এতদিন পরে ঘর দুয়ার বলতে বাকী কিছু ছিল না। রাসমণি আসবার আগে লোক পাঠিয়ে মাটির ঘর বানিয়ে নিলেন। তেরাত্তির বাস করবেন। আসাতো হয় না, আর হবে কিনা তাই বা কে জানে। তাই যখন আসছেনই তেরাত্তির বাস করে যাওয়াই ভাল। নাইবা হলো জানবাজারের মত চক মিলান বাড়ি, হোক না সেই মাটির কাঁচা ঘর। সে ঘরে কি তিনি কখনও থাকেননি?

কোনা গাঁ ভেঙ্গে এলো। আসবেই তো! রাণী রাসমণি যে এ গাঁয়ের মেয়ে। সবাইর আপনজন। শুধু কি কোনা গাঁ?—হালিসহর,

নৈহাটি, কাঁচরাপাড়া, কাঞ্চন পল্লী, জোঠ, মালঞ্চ, বিজনে, হুগলী, বংশবাটি, বালি—আরো কত সহর গাঁয়ের লোকে কোনা গাঁ ভরে গেল। রাণী রাসমণি এসেছেন—দেখতে হবে তাঁকে, নিজের সুখ সুবিধার কথা বলতে হবে।

রাসমণির দ্বার অবারিত। দর্শনপ্রার্থী কখন ঘুরে যায় না।

রাণীর সাক্ষাৎ পেয়ে সকলেই খুশি, আপ্যায়নে মুগ্ধ, আদরে অভিভূত।

যে দিকে দেখেন রাসমণির চোখে জল আসে। বাপমায়ের স্নেহ, পিসির আদর, খেলার সাথীদের ভালবাসা সবগুলিই মনের দরজায় ভিড় করে আসে। যে দিকে তাকান সবই স্মৃতি মাখান। কত দিনের কথা, তখন যারা ছোট ছিল আজ তারা বড় হয়েছে, তখন যারা বড় ছিল আজ তারা বুড়ো—তখন যারা বুড়ো ছিলেন আজ তারা কেউ নেই—কিন্তু স্মৃতিটুকু আছে।—রাসমণি ছেলে মানুষের মত কাঁদলেন।

তারপর সামলে নিয়ে কাকেও দিলেন টাকা, কাকেও বা কাপড়, কেউ বা পেল খাবার, কারো বা করলেন দেনা শোধ।—নতুন বৌয়েরা পেল যৌতুক, ছোট ছেলে মেয়েরা পেল খেলনা, গাঁয়ের বুড়ো, অন্ধ আতুর পেল সাহায্য।—রাণী রাসমণি শুধু নামেই রাণী না, কাজেও রাণী। যেমন সবার উপরে উঠেছেন তেমন সবার সঙ্গে মিশে আছেন। —আপদে বিপদে, সুখে সম্পদে সবারই তিনি ভরসা।

ছেলে বেলার খেলার সাথীরা সবাই একে একে এলো কিন্তু একজন এলো না।—ঘোষেদের মেয়ে তরুলতা। তরুলতার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু তখন গাঁয়েই ছিল ; রাসমণি খবর পাঠালেন,—তুমি না এলে আমিই তোমার বাড়ি যাব।

এ কথা শুনে তরুলতা এলো।

রাণী বললেন, সবাই এলো তুমি তো এলে না ; আমি না ডাকলে তুমি আসতে না ?

তরুলতা মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। বড় লজ্জা,

সে কথা কি বলতে পারা যায়? রাণী কি ভাববেন!—রাসমণি জেদ ধরলেন, সে কথা শুনতেই হবে।

অনেক দিন আগের, সেই ফেলে-আসা ছেলে বেলার ঘটনা তরুলতা বলল।—পিসি ক্ষেমংকরী নিষেধ করেছিলেন।—তরুলতার মা সে কথা শুনে তরুলতাকে বারণ করেন।

রাসমণি বললেন, তবে তুমি যে এলে!

থাকতে পারলাম না ভাই।—তরুলতা বলে, একটু অভিমান হয়েছিল, তুমি না ডাকলে আমি আসব না ঠিক করেছিলাম।

রাসমণি হেসে বললেন,—চল, তোমার মায়ের কাছে যাব। আমি ক্ষমা চেয়ে নেব।

তরুর মায়ের বয়স হয়েছে।—বাবা বেঁচে নাই।—আসবার সময় তরুকে টাকা, কাপড়, তরুর মাকে পাটের কাপড় ও টাকা উপহার দিয়ে এলেন।

সারা গাঁয়ের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে রাণী রাসমণি বাপের ভিটেয় তেরাত্তির কাটিয়ে জানবাজারে ফিরে এলেন।

আসবার আগে কয়েকজন ব্রাহ্মণ এসে প্রার্থনা করল,—মা আমাদের গঙ্গায় কোন ঘাট নাই, স্নানের বড় অসুবিধা হয়। তুমি এ অসুবিধা দূর করে দাও।

রাণী তখনই ঘাটের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করে গেলেন।—মা রামপ্রিয়ার নামে গঙ্গায় বাঁধান ঘাট বানিয়ে দিলেন।

হুগলী থেকে যারা এসেছিলেন তাঁদের একটি ঘাটের প্রয়োজন শুনে রাণী সেখানেও ঘাটের টাকা মঞ্জুর করে যান।

বাবুগঞ্জেও একটি স্নানের ঘাট—রাণী রাসমণির ঘাট আছে।

রাসমণির বাড়ির সামনে লোকের ভিড় জমে গেছে। দলে দলে জেলেরা সব দাঁড়িয়ে আছে। সবাই রাণীর প্রজা।—রাণীর দরবারে এসেছে নালিশ জানাতে।

রাণী জানতে চাইলেন তারা কি চায় ?

রাণী মা ! কাতর ভাবে সমস্বরে উত্তর এলো,—আমাদের তুমি না বাঁচালে বাঁচার আর পথ নাই। জলপুলীশ জল কর বসিয়েছে—গঙ্গায় মাছ ধরলেই খাজনা দিতে হবে। আমাদের পৈতৃক ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে—তোমার চোখের উপরেই আমরা স্ত্রী পুত্র নিয়ে না খেয়ে শুখিয়ে মরব ?—বড় বড় লোকেরা এ খাজনা মুকুব করে দেবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন কিছু হয়নি। রাজা রাধাকান্ত দেবের কথাও কোম্পানি রাখেনি।

রাণী আশ্বাস দিলেন।—জেলেরা আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল।—রাণীমা যখন অভয় দিয়েছেন তখন আর ভয় নাই।—ওরা নিশ্চিন্ত হলো।

রাসমণি সরকারের কাছে বহু আবেদন নিবেদন করলেন, কিন্তু সরকার কিছু শুনতে চাইলেন না।—কোম্পানি জানালেন, যা হুকুম একবার দেওয়া হয়েছে তা আর রদ করা চলবে না।—হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না।

কোম্পানি তখনও রাণী রাসমণির পরিচয় পায়নি।—রাণীও জেদ ধরলেন হুকুম নাড়তে পারা যায় কিনা দেখা যাক। মনে মনে পরিকল্পনা ঠিক করে নিয়ে রাণী কলকাতায় গঙ্গার সমস্ত অংশটাই বছরে দশ হাজার টাকায় ইজারা নিলেন। উত্তরে কাশীপুর থেকে দক্ষিণে মেটেবুরুজ পর্য্যন্ত।—পাকা-পাকি দলিল রেজেষ্ট্রি হয়ে গেল।

জলপুলীশ মনে করল খুব জিতে গেছে।—কিন্তু তাদের আত্মপ্রসাদ কয়েক দিন পরেই কর্পূরের মত উবে গেল।—রাণীর ফন্দি তারা বুঝতে পারেনি। রাণীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি যে তাদের কচু-কাটা করবে একথা তারা ভাবতে পারেনি।

দলিল রেজেষ্ট্রি হয়ে যেতেই রাণী নিজের লোকদের হুকুম দিলেন গঙ্গায় চেন ফেল।—আমার ইজারা লওয়া নদীতে আমি জাহাজ বা ষ্টিমার চলতে দেব না।

কর্মচারীরা কোমর বেঁধে নেমে পড়ল। রাণী রাসমণির উপরে তাদের অগাধ বিশ্বাস।—কোম্পানির লোকেরা অসন্তুষ্ট হবে জেনেও তারা ভ্রুক্ষেপ করল না। নদীর উপরে বয়া ভাসিয়ে দিয়ে লোহার শিকল বেঁধে রাখল।

চারদিকে হুলস্থূল পড়ে গেল। কলকাতার কোন ঘাটে ষ্টীমার ভিড়তে পারে না।

ব্যবসাদারেরা মাথায় হাত দিয়ে বসল। জাহাজ ষ্টীমারের মালিকেরা সরকারকে চাপ দিল।

জলপুলীশের লোক ছুটে এলো রাণীর কাছে। বয়া তুলে নাও, জাহাজ চলাচলের রাস্তা ছেড়ে দাও।

রাণী বললেন, সে কি করে হবে ? আমি অতগুলো টাকা দিয়ে নদী ইজারা নিয়েছি। আমার টাকার লোকসান কে দেবে ? নদীতে জাহাজ চললে মাছের ডিম নষ্ট হয়ে যাবে, মাছ পালিয়ে যাবে, মাছ ধরতেও অসুবিধা হবে সুতরাং আমি কি করে নদীর পথ ছেড়ে দেব। টাকা দিয়ে জল জমা নিয়েছি ঠিক কিন্তু টাকা তো জলে ফেলিনি। সরকার গুণে গুণে টাকা নিয়ে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। আপনারা যান, এ বিষয়ে আমি কিছু করতে পারব না।

কি সর্ব্বনাশ ! সরকার মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। রাসমণির নামে মামলা দায়ের করলেন। হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মামলা চলল। মামলায় সরকার হেরে গেলেন।

ব্রিটিশসিংহ পেটের নিচে লেজ গুটিয়ে মাথা নিচু করে রাণীর সামনে দাঁড়ালেন। রাণী বললেন,—বেশ আমি ছেড়ে দিতে পারি, তার আগে সরকারকে জলকর উঠিয়ে দিতে হবে আর জলকর বসাবেন না কথা দিতে হবে। আর আমার দশ হাজার টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। নিরুপায় সরকার তাতেই রাজি হলেন।

জেলেরা দুহাত তুলে রাণীর জয়জয়কার করল। দেশের লোক প্রশংসার দৃষ্টিতে রাণীর দিকে তাকাল। ইংরাজ সরকার মনে মনে

তারিফ করলেন। লোকে বুঝলো রাসমণির সঙ্গে লাগতে গেলে অনেক চিন্তা করে তবে লাগতে হবে ;—দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ কোম্পানি যাকে বড় বড় রাজারা পর্য্যন্ত সমীহ করে চলেন, সেই কোম্পানি সরকারকে রাণী রাসমণি হুকুম ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করলেন।

তখন কলকাতার পথে ঘাটে লোকের মুখে শোনা যেত—

ধন্য রাণী রাসমণি রমণীর মণি,
বাংলার ভাল যশ রাখিলে আপনি।

শুধু এই একবার নয়। কোম্পানি সরকার রাণীর হাতে আরো দু'একবার জব্দ হয়েছেন।

দুর্গাপূজা এসেছে। বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব। ষষ্ঠির বোধন হয়ে গেছে, আজ সপ্তমী। কলাবৌ গঙ্গায় স্নান করান হবে। ঢাকের কাঠি বেজে উঠল ঢ্যাম কুর কুর ঢ্যাম কুর কুর। জান বাজারের রাস্তা কেঁপে উঠল। শুধু একটা পূজা নয় আর একটা ঢাকের বাদ্যি নয়। যাকে বলে বাদ্যির মেলা।—রাস্তার ধারে এক সাহেবের বাড়ি। নেটিভদের বাজনার জ্বালায় সাহেবের বিশ্রামের ব্যাঘাত হলো। তিনি আইন দেখিয়ে এরকম বিশ্রাম ব্যাঘাতের জন্য রাণী রাসমণির নামে মামলা করলেন।

রাণী জানালেন এ রাস্তা তোমাদের নয়, এ রাস্তা আমার, আমার জায়গায়। আমার স্বামী এ রাস্তা করে গেছেন। এ রাস্তায় আমি যা খুশি করতে পারি।

এতে কারো বাধা দেবার অধিকার নাই। তোমরা যদি বেশী গোলমাল কর আমি রাস্তা বন্ধ করে দেব। রাণী নিজের স্বত্ব প্রমাণ করার জন্য রাজচন্দ্রকে দেয়া গ্যারিসন অফিসারের দলিলখানা পাঠিয়ে দিলেন।

রাণীর হাতে নাজেহাল হয়ে সে কথা এত সহজে কোম্পানি সরকার ভুলবার পাত্র নয়। শান্তিভঙ্গের দায়ে রাণীর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হলো।

কোম্পানি যত বড়ই হোক, রাণীও কম নয়।—মনে মনে বললেন, আচ্ছা দেখা যাক হাকিমের হুকুম আবার নড়ান যায় কি না।—

হুকুম দিলেন, আমার জায়গায় আমি রাস্তা বানিয়েছি। রাস্তা আটকে দাও। আমার জমির উপর দিয়ে আমার হুকুম ছাড়া লোক চলাচল করতে পারবে না।

রাণীর হুকুমে রাস্তার দু'ধারে শক্ত বেড়া উঠল। রাস্তা বন্ধ। সরকার থেকে হুকুম হলো বেড়া উঠিয়ে নাও।

রাণী বললেন,—আমার জায়গায় আমি বেড়া দিয়েছি এখানে আপনার হুকুম শুনব না। যদি আপনাদের আইনে এ জায়গা আপনাদের আবার ফিরিয়ে নেবার ক্ষমতা থাকে, আপনারা ফিরিয়ে নিন। আমি বেড়া এমনি তুলব না।

হুকুমের পর সরকারি হুকুম আসতে লাগল। কিন্তু রাণী অটল। চোখ রাঙ্গিয়ে যখন কাজ হলো না, তখন সরকার সুর নামালেন। কারণ কাজটা সরকার বেআইনী করছিলেন।

এবার আরম্ভ হলো নরম অনুরোধ। কিন্তু রাণী শুনবেন না। অবশেষে সরকার জরিমানার টাকা ফিরিয়ে দিলেন।

রাণী বেড়া তুলে দিলেন।

যে কোম্পানির ভয়ে আসমুদ্র হিমাচল শঙ্কিত সে কোম্পানিকে রাণী একবার নয় দু'বার তাঁর কাছে মাথা নিচু করতে বাধ্য করেছেন। রাণীর সঙ্গে সরকারের আপোষের সর্ত্ত হলো—ঐ রাস্তায় পূজা পার্ব্বনে ঢাক ঢোল বাজবে, উৎসব অনুষ্ঠান হবে, তবে তার আগে সরকারের কাছ থেকে একটি অনুমতি পত্র (পাশ) নিতে হবে। কোম্পানির আমলে কোম্পানির সদরে বসেই রাণী বুঝিয়ে দিলেন ঘরের বৌ হলেও তাঁকে তুচ্ছ করবার নয়। তিনি রাণী সুতরাং তাঁর সঙ্গে চোখ রাঙ্গিয়ে চললে তার ফল ভাল হবে না।—কোম্পানিও বুঝল যে এর পর থেকে রাণী রাসমণির সঙ্গে ব্যবহারে সংযত না হলে তারাই অপদস্ত হবেন।

আবার চারণ কবিরা রাণীর নামে ছড়া বাঁধলেন। বাংলাদেশ জুড়ে তখন ভাটের মুখে শোনা যেত ঃ—

আট ঘোড়ার গাড়ী দৌড়ায় রাণী রাসমণি।
রাস্তা বন্ধ করতে পারলেনা তাই কোম্পানি ॥

রাণী রাসমণির সাহস ছিল, আর ছিল বুদ্ধি ও তেজ। তিনি ভয়ে কখন পিছু হটতে জানতেন না। দরকার হলে মহাশক্তির মত অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়াতেন।

তখন সবে মাত্র সিপাহী বিদ্রোহ থেমেছে। উন্মত্ত গোরারা দেশের বুকে অবাধে খুশি মত কাজ করছে। যেন কতগুলি পাগলা কুকুরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রায় আড়াইশ' গোরার একটা দল ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটে থাকত। তারা ছিল ভীষণ প্রকৃতির। কাউকে বিশেষ মানত না।

ইচ্ছামত সহরে ঘুরে বেড়ায়। একা পেলে ছিনতাই করে। খাবারের দোকানে ঢুকে খাবার খেয়ে সব ভেঙ্গে চুরে দিয়ে যায়। খুশি হলে টাকাকড়িও ছিনিয়ে নেয়।

এই গোরাদলের ভয়ে সকলেই শঙ্কিত। কখন কাকে অপমান করে, কখন কোথায় লুটপাট করে কিছু ঠিক নাই।

একদিন সন্ধ্যার দিকে তিন চারজন মাতাল হয়ে হল্লা করতে করতে জানবাজারে ঢুকে পড়ল।

একজন পথিককে পাকড়াও করে তার উপরে অত্যাচার চালাল। পাশেই রাণীর কুঠি। রাণীর জামাইরা তখন ছাদে পায়চারি করছিলেন, দৃশ্যটি তাঁদের চোখে পড়ল।

উপর থেকে দারোয়ানদের হুকুম দিলেন। দারোয়ানরা যেয়ে পথিককে ছাড়িয়ে দিয়ে গোরাদের বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। রাণীর জামাইরাও উপর থেকে বড় বড় মাটির টব ছুঁড়ে মারেন।

গোরারা পালিয়ে গেল।

একটু পরেই চল্লিশ পঞ্চাশজন গোরা খোলা তরোয়াল হাতে

জানবাজারের ছুটে এলো।

নেটিভের হাতে মার, নেটিভের হাতে অপমান, কিছুতেই সহ্য করা হবে না! মাতাল গোরার দল জানবাজার জমিদার বাড়ির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দারোয়ানরা গেট বন্ধ করে দিল।

তখন বড় বড় বাড়ির গেট হতো লোহার কবাট দিয়ে। সেই কবাটের মাঝখানে আবার ছোট একটা দরজা থাকত। ঠিক যেমন দুর্গে থাকে। গেট বন্ধ হয়ে গেলে যদি কোন প্রয়োজন পড়ত তবে ঐ ছোট দরজা দিয়ে তখন যাতায়াত করত।

গোরার দল একটা বেঞ্চ তুলে নিয়ে ছোট দরজাটা ভেঙ্গে ফেলল। তারপর ভিতরে ঢুকে লোহার দরজা খুলে দিল।

তরোয়াল হাতে উন্মত্ত গোরার দল—এদিকে মাত্র কয়েকজন দারোয়ান লাঠি হাতে। কতক্ষণ আর বাধা দেবে?

গোরারা চারদিক লণ্ডভণ্ড করে, হাতের কাছে যা কিছু পেল—পশু পাখি কিছুই বাদ দিল না—তরোয়ালের ঘায়ে কেটে টুকরো টুকরো করে উপরের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

রাণীর মেয়ে জামাইরা ছেলে মেয়েদের নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে মান্নাবাবুদের বাড়ি চলে গেছেন। চাকর দারোয়ান তারাও গা ঢাকা দিয়েছে, দেননি শুধু রাণী নিজে।

কোমরে কাপড় বেঁধে হাতে খড়্গ নিয়ে রুদ্রাণীর মত সিঁড়ির মুখে ঠাকুর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে।

সে দিকে তাকিয়ে মাতাল গোরাদের চৈতন্য হলো। যে এগিয়ে যাবে তাকে আর ফিরে আসতে হবে না। আর রাণী খড়্গ হাতে এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন উপরে উঠতে হলে ঐখান দিয়েই একজন একজন করে উঠতে হবে। তাছাড়া রাণী দাঁড়িয়ে আছেন উপরে।

যুদ্ধ-বিদ্যায় অভ্যস্ত গোরাদের চৈতন্য হলো। এগিয়ে গেলেই

এই চল্লিশ পঞ্চাশটি গোরার একটিও বাঁচবে না। সংখ্যা গরিষ্ঠতা এখানে কোন কাজ করবে না।

গোরার দল থমকে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে মথুরাবাবু ফিরে এসেছেন। নিচে এসেই অবস্থা দেখে ইনস্পেক্টরের সঙ্গে দেখা করে গোরাদলের অধিনায়কের কাছে খবর পাঠালেন। সঙ্গে আরো লোক নিয়ে অধিনায়ক ছুটে এলেন।

সাপের মাথায় ধূলো পড়া পড়ল। যদিও তার আগে মাথায় ঘা পড়েছে, ফণা নামালেও একেবারে গুটিয়ে ফেলেনি। কিন্তু এবার ফণা গুটাতে হলো।

সেদিনের মত গোলমাল থামল বটে কিন্তু ভবিষ্যতে যে আবার হবে না সে কথা কে বলতে পারে?

রাণী সেদিনই বাড়ি পাহারা দেবার জন্য বারোজন গোরা সৈনিক বেতন দিয়ে রাখলেন। তারপর সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিলেন।

রাণীর মত সাহস, তেজ ও বুদ্ধি তখন কেন এখনও তুর্লভ। শুধু মেয়ে নয় ছেলেদের মধ্যে এত তেজ, এত সাহস, এত বুদ্ধির সমাবেশ কম দেখা যায়।

জগন্নাথপুর তালুক রাণীর।

নড়াইলের জমিদার রামরতন রায় নিজের লোক দিয়ে রাণীর তালুকে অত্যাচার করাতে লাগলেন। মনে গোপন ইচ্ছা, এ তালুকটি তিনি নিজের জমিদারী ভুক্ত করে নেবেন।

রাণীর এত পরিচয় শুনেও রামরতনবাবুর জ্ঞান হয়নি। তিনি জমিদারি চাল চালতে লাগলেন। রাণীর তালুকে ঢুকে লুটপাট, ঘর জ্বালান, খুন—তিনি কিছুই বাদ দিলেন না। প্রজারা এসে রাণীর কাছে কেঁদে পড়ল।

রাসমণি মহাবীর সর্দ্দারকে পাঠালেন।

মহাবীরের শক্তি ছিল অসুরের মত, চেহারাও ছিল সেরকম।

কিন্তু মনটি ছিল নরম। একদল পাইক ও লাঠিয়াল নিয়ে মহাবীর জগন্নাথপুরে এলো। রামরতনবাবু অন্য পন্থা অবলম্বন করলেন। দাঙ্গা, লুটতরাজ বন্ধ হলো। মহাবীরের ভয়ে তিনি কিছু করতে সাহস পাচ্ছিলেন না। বুঝলেন যে সামনাসামনি মহাবীরের দলের সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব নয়। গুপ্তঘাতক লাগালেন।

মহাবীর গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিল।

জগন্নাথপুরের নায়েব প্রতিশোধ নেবার জন্য বিরাট আয়োজন করলেন। বর্দ্ধমান, হুগলি, চব্বিশ পরগণা যেখানে যত লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালা ছিল সংগ্রহ করলেন।

সে সব ভীষণ দর্শন পাইক ও লঠিয়ালেরা যখন রাণী মাইকি জয় বলে অস্ত্র হাতে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল, রামরতনবাবুর লোকেরা বুঝল এবার ঝড় আসছে। প্রাণের ভয়ে তারা কাঁপতে লাগল, বাধা দেবে কে।

রাণীর কাছে খবর যেতে তিনি অনর্থক প্রাণহানি করতে নিষেধ করে পাঠালেন।—কেবল প্রজাদের রক্ষা করবার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু করতে বললেন।

কামড়াবার আর দরকার হলো না। ফোঁস করতেই কাজ হলো। রামরতনবাবুর দলবল ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। রাণীর হুকুম পেয়ে জগন্নাথপুরের নায়েব রামরতনবাবুকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, যদি রাণীর তালুকের উপরে কোন রকম অত্যাচার হয়, তাহলে এবার আর চুপ করে থাকা হবে না। এইসব লাঠিয়াল ও পাইকেরা রামরতনবাবুর তালুকে চড়াও হবে। তিনি যেন চিন্তা করে কাজ করেন।

রাণী শুধু পাইক পাঠিয়েই চুপ করে ছিলেন না। মামলা করে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিয়েছিলেন।

একবার রাণী গেছেন নবদ্বীপ।

তীর্থ সেরে বাড়ি ফিরছেন।—রাণীর নৌকা চলেছে। নদীর বুকে সন্ধ্যা নেমে এলো।

গরুটি, মানে চন্দননগরের কাছে রাণীর নৌকা। দুধারে ঘন জঙ্গল। তখন পথঘাটও খুব নিরাপদ নয়। রাণী সতর্ক ছিলেন।—গরুটি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ডাকাতেরা নৌকা চড়াও করল।

রাণী রাসমণি কোম্পানিকে ভয় করেন না, প্রতিপক্ষ জমিদারকে গ্রাহ্য করেন না, আর তিনি ভয় পাবেন একদল ডাকাতকে!

হুকুম দিলেন, লাঠি চালাও, বন্দুক চালাও।—

ডাকাতদেরও বন্দুক ছিল, তারাও বন্দুক চালল। রাণী নিজে দাঁড়িয়ে হুকুম দিলেন।

পাইক বরকন্দাজদের বুকে বল বাড়ল শতগুণ।

ডাকাতেরা কয়েকজন ঘায়েল হলো।

ডাকাতেরা বুঝল তারা যেমন বুনো ওল এবার তেমন বাঘা তেঁতুলের পাল্লায় পড়েছে।

বলে পাঠাল, রাণীমা আমরা টাকার জন্য এসেছি—খুনোখুনি করা আমাদের ইচ্ছা নয়। আপনার অপমান করব একথা আমরা ভাবি না! এখন আপনি যা ভাল বোঝেন করুন।

রাণী দেখলেন, সংখ্যায় ডাকাতেরা বেশী। তাছাড়া অকারণে রক্তারক্তি করাও তিনি পছন্দ করেন না।

বলে পাঠালেন, আমি আজ ফিরছি, সঙ্গে বেশী কিছু নাই, আজ তোমরা ফিরে যাও। কাল এসময়ে এখানে এসো, আমি টাকা পাঠিয়ে দেব। ডাকাতেরা রাণীর নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে আবার জঙ্গলে ফিরে গেল।

রাণী রাসমণির মুখের কথা—আকাশের সূর্য্য নড়বে তবুও রাণীর কথা নড়বে না, একথা তারা ভাল করেই জানতো।

রাণী রাসমণি ডাকাত বলে তুচ্ছ করে কথার খেলাপ করেননি। পরের দিন ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় টাকা পাঠিয়ে দেন।

এই হচ্ছে রাসমণির চরিত্র। অন্যায় করলে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান, কাঁদলে মায়ের মত টেনে নেন। একদিকে যেমন তেজ

অন্যদিকে তেমন মায়া। একদিকে যেমন দুর্ব্বার সাহস অন্যদিকে তেমনই মাখনের মত কোমল।

বাংলাদেশ কখনো দুই মহিয়সী মহিলার নাম ভুলবে না।— পূর্ব্ব বাঙ্গলার অর্দ্ধ বঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানী আর পশ্চিম বাংলার রাণী রাসমণি। এঁদের জীবন কাহিনী শোনা মহাভারত রামায়ণ শোনার মত পবিত্র।

একবার এক ব্রাহ্মণ কন্যাদায় গ্রস্ত হয়ে রাণী রাসমণির কাছে আসেন। রাণীর প্রশ্নের উত্তরে বললেন,—মা দুটি মেয়েরই বয়স হয়েছে—দুটিকেই একসঙ্গে পার করতে চাই। মনে হয় এক হাজার টাকায় কাজ হবে না। রাণী একজন বিশ্বাসী সরকারের হাতে পনেরশ' টাকা দিয়ে ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন।—

মেয়ে দুটির বিয়ে দিতে ব্রাহ্মণের দু'হাজারের বেশী খরচ হয়। কিন্তু তিনি নিজের কথা অনুসারে রাণীর দেওয়া টাকা থেকে এক হাজার টাকার বেশী নিলেন না। বাকী টাকা সরকার ফিরিয়ে নিয়ে গেল। সরকারের মুখে সব শুনে রাণী আরো বারশ' টাকা ব্রাহ্মণের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অনুরোধ করে পাঠালেন যেন এই টাকা তিনি দয়া করে গ্রহণ করেন।—

এই ব্রাহ্মণের একটি ছেলেকে রাণী নিজের কাছে রেখে মানুষ করেছিলেন। এমন কতশত লোক রাণীর কাছে উপকার পেয়েছে তার হিসাব রাখা সম্ভব নয়।

পঞ্চম অধ্যায়

রাণী কাশী যাবেন।—সঙ্গে অনেকে যাবে।—

১২৫৫ সাল। তার মানে আজ থেকে সোয়াশ' বছর আগের কথা। তখন যাতায়াতের এত সুবিধা ছিল না।—রেলপথেও সব জায়গায় যাতায়াত করার ব্যবস্থা নাই।

রাণী যাবেন জলপথে, পঁচিশটি বজরা ঠিক করলেন।—যেতে বেশ কিছুদিন পথে কাটবে। তাই খাবার জিনিষে, বিছানাপত্রে ওষুধে নৌকা বোঝাই হলো। পথঘাট নিরাপদ নয়, পাইক বরকন্দাজ অস্ত্রে এক নৌকা বোঝাই হলো। তারপর আছে গরু, গোয়ালা, গরুর খড়, আমলা, গোমস্তা, ডাক্তার, কুটুম্ব—আরো কত জন। বলতে গেলে জানবাজার জমিদার বাড়ির একটি ছোট সংস্করণ নৌকা করে নিয়ে যাচ্ছেন রাণী।

অনেকদিন থেকেই রাসমণি বিশ্বেশ্বর ও মা অন্নপূর্ণাকে দর্শন করার কথা ভাবছেন। এজন্য খরচের টাকাও তিনি তুলে রেখেছেন। কিন্তু যাই যাই করেও যাবার সময় করে উঠতে পারেননি। এবার ঠিক করেছেন যত কাজই আসুক, যত বাধাই আসুক সব ঠেলে তিনি যাবেন।

কিন্তু যাত্রার দিন যত এগিয়ে আসছে রাসমণির আগ্রহও যেন তত কমে আসছে। তিনি শুধু শোনেন বাঙ্গালার হাহাকার।—দেশজোড়া ভুভিক্ষ—লোকের পেটে অন্ন নাই, ক্ষুধার তাড়নায় লোক পশু হয়ে উঠছে।—রাণী বিষণ্ণ চোখে সেদিকে তাকান।—কাশীযাত্রার কথা মনে পড়ে না।

শত শত লোক অকালে মারা যেতে লাগল। কেউ মরল না খেয়ে, কেউ মরল অখাদ্য খেয়ে। দিনে দিনে লোকের কষ্ট বেড়ে

চলল। রাণী গঙ্গায় স্নান করতে যান, আর দেখেন। দেখেন আর ভাবেন—কাশীর কথা ভুলে গেলেন।

রাণীর চোখের ঘুম গেল, মনের শান্তি গেল, লোকের এ কষ্ট এ তুর্দ্দশা সহ্য হয় না।

একদিন রাণী স্বপ্ন দেখলেন—মা অন্নপূর্ণা নিজে এসে তাঁকে বলছেন, ভোর বারাণসী যাওয়ার দরকার নাই। তুই ভাগীরথীর তীরে শিবশক্তি পাথরের মূর্তি স্থাপন করে রোজ রোজ পূজা করবি। তাতেই তোর কাশী যাবার ফল হবে। আমি রোজ তোর পূজো নেব—আর আমার গরীব ছেলেরা প্রসাদ পেয়ে প্রাণে বাঁচবে।

ঘুম থেকে রাণী উঠে বসলেন।—রাণী যেন মনে শান্তি পেলেন। তাইত, মা নিজে এসে বলে গেছেন।—এর চেয়ে বড় আর কি হতে পারে ?

রাণী মথুরামোহনকে স্বপ্নের কথা জানালেন।

মথুরামোহন তখনি জোগাড়ে লেগে গেলেন।—উপযুক্ত জামাই, রাসমণিও নিশ্চিন্ত হলেন।

রাসমণি কাশী যাওয়া বন্ধ করলেন।

মা অন্নপূর্ণা নিজে বলেছেন, এর উপরতো আর কথা চলে না। যত্র জীব তত্র শিব।

দেশের লোক তুর্ভিক্ষে না খেয়ে মরছে, এখন কি রাণীর দেশ ছেড়ে যাওয়া চলে ?

কেউ কেউ বলে, রাণী দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত যেয়ে মা অন্নপূর্ণার আদেশে ফিরে এসেছেন। যে জন্যই ফিরে আসুন দেশময় হাহাকারে রাণীর কোমল মনে আঘাত লাগল।

মথুরানাথকে নৌকোর সব জিনিষ বিলিয়ে দিতে বললেন।—

মথুরানাথ সব বিলিয়ে দিলেন।

রাণী বললেন, এবার শিবশক্তি স্থাপন করতে হবে। মা বলেছেন রোজ রোজ আমার পূজা নেবেন। প্রসাদ পেয়ে লোকের প্রাণ

বাঁচবে। মন্দির স্থাপন করতে গঙ্গার তীরে জায়গা চাই।

মথুরানাথ উঠে পড়ে লাগলেন।

রাসমণি গরীবের মেয়ে ছিলেন। হলেনই বা কোটিপতি ঘরের বউ—হলেনই বা রাণী—গরীবের দুঃখ কি জানেন। তাই গরীবের জন্য এত মায়া। পুণ্যশ্লোকা তিনি, অমর হয়ে আছেন।

'গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসীর সমতুল'—তাহলে আর বারাণসী যাওয়া কেন?

পূর্বকূলে কলকাতা পশ্চিমকূলে বালী উত্তরপাড়া। রাণীর লোকজন ছুটল উপযুক্ত জায়গার সন্ধানে গঙ্গার পশ্চিমকূলে। কিন্তু কই, কোথায় আছে সে জায়গা যেখানে শিবশক্তির মন্দির স্থাপন করতে পারা যায়।

রাসমণি আগে ছিলেন রঘুনাথজির উপাসিকা। এখন হয়েছেন শক্তি-সাধিকা। খড়্গ হাতে যেদিন রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন—সেদিন থেকেই পরিবর্ত্তন।

ঠাকুর বলতেন—অষ্ট সাধিকার একজন।

গঙ্গার পশ্চিমকূলে মনমত জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। যা পাওয়া যায় উপযুক্ত নয়। কি আর করা যাবে। খুঁজে খুঁজে একটা জায়গা পাওয়া গেল—কিন্তু তেমন পছন্দ হলো না—মন্দের ভাল। কি আর করা যাবে। রাণী জায়গাটা কিনতে চাইলেন। জায়গাটা ছিল দশ আনি দু আনি জমিদারির। অনেক টাকা দিলে জায়গাটা কেনা যায় বটে কিন্তু জমিদারেরা অন্যের ঘাট দিয়ে গঙ্গায় যাওয়া আসা করবেন কি করে! এ সমস্যার সীমাংসা হলো না।

রাণী গঙ্গার পশ্চিম কূলের আশা ছেড়ে দিলেন।

কলকাতার কাছেই রাণী খুঁজতে বললেন।

পাওয়া গেল। কলকাতার আড়াই ক্রোশ দূরে দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বর—যে দক্ষিণেশ্বর পীঠস্থান হবে, ঠাকুর যেখানে মর্ত্তে লীলা করে যাবেন—সেই দক্ষিণেশ্বর।

জায়গাটার অর্দ্ধেক ইংরাজ হেষ্টি সাহেবের, অর্দ্ধেক মুসলমানদের কবরখানা। গাজি সাহেব পীরের স্থান।

রাণীর পছন্দ হলো। সাধন ভজনের জন্যে যে রকম স্থানের কথা সাধু সজ্জনেরা বলেন—সে রকম। যেন পিঠ ছড়িয়ে একটা প্রকাণ্ড কাছিম পড়ে আছে।

শাস্ত্রে বলে এ রকম শ্মশানেই দেবী প্রতিষ্ঠা করতে হয়। শাক্তমতে এ রকম জায়গাই শক্তি সাধনার জন্য উৎকৃষ্ট।

রাণী জায়গাটা কিনে নিলেন—ষাট বিঘা জমি। সে দিনটি ছিল ১৮৪৭ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর।

মহা উৎসাহে মন্দিরের কাজ আরম্ভ হলো। একটু একটু করে মন্দির উঠতে লাগল। মথুরামোহন রোজই দেখে যান। রাণীও আসেন। আসে আরো অনেকে। শিবশক্তি স্থাপন হবে দেবীর আদেশে। রাণী ঠিক করলেন দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থা করে দেবেন।

মন্দির শেষ হলো—মনের মত মন্দির। দূর থেকে চূড়া দেখা যায়। মন্দিরের গায়ে মা গঙ্গা। চারদিকে কেমন স্নিগ্ধ ভাব।

রাণীর মনে কিন্তু শান্তি নাই। মা নিজে ভোগের ব্যবস্থা করতে বলেছেন। কিন্তু কি করে সে কাজটি হবে? দেবীর মনের মত করে সেবা করবেন কি করে? তিনি যে মাহিষ্য ঘরের মেয়ে, মাহিষ্য ঘরের বউ। হলেনই বা রাণী—কিন্তু দেবপূজার নিয়ম আছে তো? শাস্ত্র মানতে হবে তো? শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ তো আর হতে পারে না। কি জানি দেবীর কি ইচ্ছা—নিজ মুখে ভোগের ব্যবস্থা করতে বলেছেন—না করলেই নয়।—কিন্তু এদিকে যে জাতটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে!

রাণী ভেবে কূল পান না—ভাবেন, অন্ন ভোগ তিনি দিলে দেবী কেন গ্রহণ করবেন না? শাস্ত্রে এ বাধা কেন! দেবতাও কি জাতি বিচার করেন? মার কাছে কি কোন ছেলে অশুচি থাকে? তিনি

কি শুধু উঁচু জাতেরই মা ? তবে মা স্বপ্নে এ আদেশ করলেন কেন ? রাসমণি কি করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। একবার ভাবেন ভোগের ব্যবস্থা করে ফেলি। আবার ভাবেন তা কি করে হবে ? দেশাচার না মেনে নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ কি করে করবেন ? যদিই বা করেন কোন ব্রাহ্মণ সজ্জন তো প্রসাদ গ্রহণ করবে না। যদি তাই হয় তাহলে অনর্থক এই মন্দির, অনর্থক এই পূজা।

আকুল হয়ে রাণী পণ্ডিতদের মত চেয়ে পাঠালেন। কাশী, গয়া, প্রয়াগ থেকে আরম্ভ করে ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ সব জায়গাতেই রাণী লোক পাঠালেন। কিন্তু সবই বৃথা। অনুকূলে কোন পণ্ডিতই মত দিলেন না।

রাণী হতাশ হয়ে পড়লেন। বুঝি মায়ের ইচ্ছা পূরণ হলো না! একি পরীক্ষায় মা ফেললেন ?

রাণী যখন সব আশা ছেড়েছেন, তখন এক ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ব্যবস্থা পত্র নিয়ে এগিয়ে এলেন।

রাণীর মুখে আবার হাসি ফুটল। মা তাহলে নিজের উপায় নিজেই করে দিলেন। কি আশ্চর্য্য, একথা তো রাণীর মনে হয়নি! পণ্ডিতরাও বলেননি।

অধ্যাপক বললেন,—মা আপনি মন্দির ও সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান করুন, তাহলেই আর কোন দোষ থাকবে না। আপনার দান গ্রহণ করে আপনার হয়ে সেই ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে অন্ন ভোগ দিলে সেই প্রসাদ সকলেই গ্রহণ করবে। কোন বাধা থাকবে না।

কলকাতার ঝামাপুকুর টোলের অধ্যাপক পণ্ডিত রামকুমার ভট্টাচার্য্য এ ব্যবস্থার পরামর্শ দিলেন। পণ্ডিতেরা শুনে বললেন, তা হতে পারে। এতে আপত্তি করার কিছুই নাই। এ বিধান শাস্ত্রে আছে।

ঠিক হলো রাসমণি নিজের কুল গুরুর নামে সম্পত্তি ও দেবালয়

প্রতিষ্ঠা করে তাঁর অনুমতি নিয়ে দেব সেবা করবেন।—গুরুদেব রাজি হলেন।

মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠা হলো। মা জগদম্বার ইচ্ছাও পূর্ণ হলো।

কালী পূজার পূজক কোথায় পাওয়া যায়? রাসমণি চিন্তিত হলেন। শক্তি পূজার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ না পেয়ে রাণী আবার রামকুমার ভট্টাচার্য্যের স্মরণ নিলেন। যার শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা না আছে সে শক্তিপূজার অধিকারী নয়। রামকুমারের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা ছিল। তিনি ছিলেন সাধক-ভক্ত।

দেবী মূর্ত্তিকে রাণী এতদিন যত্ন করে বাক্সে বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলেন। কি জানি যদি মূর্ত্তির গায়ে কোন্ আঘাত লাগে।

মূর্ত্তি বানিয়ে মূর্ত্তিকে তুলে রেখে দিয়ে রাণী কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। তিন সন্ধ্যায় তিনবার স্নান, হবিষ্য আহার, ভূমিতে শয্যা—রাণী কঠোর তপস্যায় নিজেকে ঢেলে দিলেন। মন্দিরে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কঠোর তপস্যা করে যাবেন ঠিক করলেন।

এমনি করে দিনের পর দিন কেটে গেল, দেবী রাণীকে স্বপ্ন দিলেন।—আর কতদিন আমাকে এভাবে আটকে রাখবি? আমার যে বড় কষ্ট হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি পারিস আমাকে প্রতিষ্ঠা কর।

রামকুমার শুনলেন।

মন্দির তৈরী হয়ে পড়ে আছে।

রাণী কৃচ্ছ্রসাধন করছেন—দেবী নিজে কষ্টের কথা জানাচ্ছেন—রাণী ও তাঁর ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারিরা রামকুমারকে পূজার ভার নিতে অনুরোধ করলেন। যতদিন উপযুক্ত পূজারি না পাওয়া যায় ততদিনের জন্য রামকুমার পূজার ভার গ্রহণ করতে রাজি হলেন।

১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হলো।

রাসমণির মনে আজ বড় আনন্দ। মা জগদম্বার ইচ্ছা পূর্ণ হবে—নিজের আকাঙ্খা পূর্ণ হবে। দেবীর প্রসাদ পেয়ে লোকে বাঁচবে। ছোট বড় সকলেই দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করবে।

প্রতিষ্ঠা যজ্ঞের বিরাট আয়োজন।—

গৌড়াছ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র পাঠ করলেন। চারিদিক থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সে-দিন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠায় উপস্থিত হলেন। কাশী, কাঞ্চী, প্রয়াগ, মথুরা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, উড়িষ্যা—দিক দিক থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এলেন।

রাণী পণ্ডিত বিদায় করলেন। দামি রেশমি কাপড় ও চাদর, একটি করে মোহর পণ্ডিতেরা বিদায় প্রণামি পেলেন।

মন্দির প্রতিষ্ঠায় রাণী নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। তারপর মৃত্যুর কিছু দিন আগে আড়াই লক্ষ টাকা দিয়ে দিনাজপুর জেলায় শালবাড়ি পরগণা কিনে দেবসেবার জন্য দানপত্র করে দিয়ে যান।

রাণী মনের আনন্দে দেবসেবার ব্যবস্থা করে দিলেন। রাম-কুমারের মত পণ্ডিত অধ্যাপকের হাতে সেবার ভার দিয়ে দেবীর সেবা ও যত্ন সম্বন্ধে রাণী নিশ্চিন্ত।

পণ্ডিত রামকুমার অধ্যাপক। টোলের ছেলেদের পাঠদান, ঝামাপুকুরের রাজা দিগম্বর মিত্রের ও আর কয়েকটি ঘরে নিত্য দেবসেবা, তার উপরে দক্ষিণেশ্বরের কাজ। রামকুমারের অতিরিক্ত পরিশ্রম হতে লাগল। টোলের আয়ে সংসার চলা তো দূরের কথা ছাত্রদের নিয়ে নিজের খরচ চলাই কষ্টকর। এজন্য এসব কাজ করতে হতো। উপরি আয়ের জন্য একাজগুলো রামকুমার বাধ্য হয়েই করতেন।

কাজে সাহায্যের জন্য কামারপুকুর থেকে ছোট ভাই গদাধরকে আনিয়ে নিলেন। গদাধর ছোটবেলা থেকে পূজা করতে ভালবাসে। তখন গদাধরের বয়স সতের আঠারো হবে। সুশ্রী, কাজে পটু, শান্ত ধীর, মিষ্টি গলা—গদাধরকে পেয়ে যজমানেরা খুশি হলেন। গদাধরও কাজে মেতে গেলেন।

রামকুমারের ইচ্ছা গদাধর লেখাপড়া শেখে। গদাধরের সেদিকে মন নাই। সব মন তার পূজায়। রামকুমার তু'একবার চেষ্টা করে ছেড়ে দিলেন। গদাধর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

গদাধরকে যজমান বাড়ির মেয়েরা বড় ভালবাসে—ডেকে কথা বলে মিষ্টি গলার গান শোনে। গদাধরেরও মনের আনন্দে দিন কাটে। রামকুমারের মনে কিন্তু সঙ্কোচ—ছোট ভাই গদাধরের লেখাপড়ায় মন নাই। পণ্ডিতের ভাই মূর্খ!

কলকাতা ছেড়ে রামকুমার দক্ষিণেশ্বর এলেন। সবই মায়ের ইচ্ছা। মা যেন রামকুমারকে টেনে নিয়ে এলেন। আনবেনই তো—গদাধর যে আছেন—সাধক রামকৃষ্ণ যে আছেন।

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে রামকুমার এলেন, সঙ্গে ছোট ভাই গদাধর। মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে—সহজ ব্যাপার নয়। শিবশক্তির যুগল মূর্তি—মা স্বপ্নে দর্শন দিয়ে নিজে আসবার ইচ্ছা জানিয়েছেন। চারদিকে যেন আনন্দমেলা বসেছে।—দক্ষিণেশ্বর হাসছে। কালী বাড়িতে যাত্রা হবে, কালীকীর্ত্তন হবে—হবে রামায়ণ গান—হবে কথকতা—পুরাণ—চণ্ডীপাঠ।—চারদিকে ব্রাহ্মণের মেলা, পণ্ডিতের মেলা। সাধু সন্ন্যাসীই বা কত! গরীব গুরবো, ছোট বড়, ভদ্র ইতর কেউ বাকী নাই। কাশী কাঞ্চী থেকে সুন্দরবন পর্য্যন্ত—লোক এসেছে—যেন মৌচাকে মৌমাছি জমা হয়েছে।

গদাধর ঘুরে ঘুরে দেখছে। যেখান দিয়ে যায়, যার কাছে এসে দাঁড়ায় সে-ই গদাধরকে দেখে। কেমন যেন ভাল লাগে। কই কত তরুণ কত কিশোর তো এই আনন্দ মেলায় এসেছে কিন্তু কেউ তো গদাধরের মত নয়।

—গদাধর যাত্রা দেখে, কালীকীর্ত্তন শোনে, রামায়ণ, চণ্ডী, পুরাণ, কথকতা শোনে।

সারারাত জ্বলে আলোর মালা। রাতকে দিন করেছে। গদাধর অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। কত আলো, আর কি সুন্দর করে

সাজিয়েছে! হাজার হাজার লোক খেয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে শুধু দাও—দাও—খেতে দাও।

রাণী অন্নপূর্ণা। ভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন। কড়া হুকুম, কেউ যেন ফিরে না যায়। এদের মুখে অন্ন দেবার জন্য কাশী থেকে মা এসেছেন দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে। এরা প্রসাদ পাবে না তো কারা পাবে? গদাধর কিছু গ্রহণ করলেন না। গঙ্গাতীরে নির্জনে দুমুঠো ফুটিয়ে নিলেন। খাওয়াই কি সব?—যার পেটের টানের চেয়ে মনের টান বেশী সে মনের খোরাক খুঁজে বেড়ায়। তাছাড়া ব্রাহ্মণ কুমার, তার একটু আচার নিষ্ঠা থাকবে বইকি! খাও বললেই তো খেতে পারেন না। নাও বললেই নিতে পারেন না।

গদাধর দক্ষিণেশ্বরে আছেন। গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে কিছু ফুটিয়ে আহারের কাজটি চুপি চুপি এক সময় সেরে নেন।

দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী।

গদাধরের বড় ভাল লাগে এই পঞ্চবটী। কি যেন এক আকর্ষণে তিনি পঞ্চবটীতে ঘুরে বেড়ান। দাদা রামকুমার বড় স্নেহ করেন। গদাধর তাঁর বড় প্রিয়। তার কোন কাজেই তিনি বাধা দেননা। শুদ্ধাচারি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, হয়ত ভাইয়ের মধ্যে কিছুর আভাষ তিনি পেয়েছিলেন।

যেমন রাণী রাসমণি তেমন তাঁর জামাই মথুরানাথ। দেবতা ব্রাহ্মণে কি অদ্ভুত ভক্তি। সে ভক্তির তুলনা হয় না। তাই তো মা এলেন তাঁদের কাছে—বাবা বসলেন আসন কেটে। নরদেহে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলার প্রকাশ হলো তাঁদের আশ্রয়ে। পরম পুরুষের সাধন ক্ষেত্র বুকে করে দক্ষিণেশ্বর হলো কলির তীর্থ, রাণী হলেন অমর, জানবাজারের মাহিষ্য জমিদারি হলো বৈকুণ্ঠ।

গদাধর নিজের হাতে রাঁধেন—নিজে খান।—অতি শুদ্ধাচারে সব

করেন। নিষেধের গণ্ডী মেনে চলেন।—কিন্তু মনে প্রশ্ন—কেন, কেন মানুষ মানুষের স্পর্শকে অভিমানের গণ্ডী মেনে দূরে সরিয়ে রাখে?

দ্বিধা ভাব কাটিয়ে গদাধর একদিন দূর করে দিলেন নিয়মের ঘেরাটোপ।

গদাধর মনের আনন্দে আছেন।—যেন কামারপুকুরে ঘরের ছেলে ঘরে—দক্ষিণেশ্বর যেন কামারপুকুর। গদাধরের কাছে দক্ষিণেশ্বর আর কামারপুকুর এক।—স্বর্গীয় আনন্দে বিভোর হয়ে থাকেন গদাধর।—তখনও সাধন ভজন আরম্ভ হয়নি—কিন্তু গদাধরের মনে স্বর্গের জ্যোতি।—হবেই তো। এই তীর্থ থেকেই তো তিনি প্রচার করেন যত মত তত পথ—সকল ধর্মের সমন্বয় কর।—এই উদার ধর্ম, এই উদার মত প্রচারের ভাবি প্রচারকর্তা সাধন ক্ষেত্রে এসেছেন।—মনে শিহরণ জাগবে না, চোখে লাগবে না স্বপ্ন? দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর প্রতিষ্ঠা হলো।—রাণীর অসামান্য ভক্তি ডোরে বাঁধা পড়ে এই পীঠস্থানেই যুগাবতার মহাপুরুষের অদ্ভুত চরিত্র বিকশিত হলো।

গদাধর দাদার কাছে আছেন দক্ষিণেশ্বরে।—কিন্তু নির্জনে থাকেন। একা একা উদাস ভাবে ঘুরে বেড়ান। কেমন যেন ভোলা ভাব, ভোলা মন। কখনও চুপ করে কোন গাছের নিচে বসে থাকেন, কখনও থাকেন গঙ্গাতীরে। কখনও দেখতে পাওয়া যায় পঞ্চবটীর জঙ্গলে।

রামকুমার ভাবলেন, ছেলেমানুষ হয়ত মায়ের কথা ভেবে ভাল লাগে না। কিন্তু সে কথাই বা বলে কই!—গদাধর নিজে কিছু বলেন না, জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর দেন না।

বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকেন।—যেন বোধ শক্তি নাই।—কেমন যেন বোবা, কেমন যেন উদাস দৃষ্টি।

রামকুমারের বয়স হয়েছে। শরীরও ভেঙ্গে পড়ছে।—তাঁর অবর্তমানে সংসারের কি হবে—আর আদরের ছোট ভাইটির মুখের

দিকেই বা তাকাবে কে ?

রামকুমার চিন্তিত।

রামকুমারের শারীরিক সামর্থ কমে আসছে।—মা নিজেই তার জন্য ব্যবস্থা করে দিলেন।

মথুরানাথ নিজেই গদাধরকে মন্দিরের কাজে লাগাতে অনুরোধ করলেন।—

ছোট ভাইটিকে রাজ বাড়ির সবাই ভালবাসে। সবারই ইচ্ছা গদাধর মন্দিরের কাজ করুক।

গদাধর মন্দিরে বেশকারী হলেন।

কে যেন আকুল গলায় গান করছে—

'ডুব্ ডুব্ ডুব্ সাগরে আমার মন,
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম রত্নধন।

সন্ধ্যার আকাশে ঘোর লেগেছে। চারিদিক শান্ত। মাঝে মাঝে গঙ্গা থেকে বায়ু প্রবাহ উঠে আসছে—স্নিগ্ধ শীতল।—সুমিষ্ট কণ্ঠের আকুল নিবেদন ছড়িয়ে পড়ছে গঙ্গার বুকে, ঢেউ তুলছে—সবুজ প্রান্তরে দোল জাগাচ্ছে গাছের মাথায়।

রাণী উৎকর্ণ হয়ে শুনছেন। কে গায়—আহা!—গানতো নয় যেন সুধার ঝরণা।—ডুব দিয়েও তৃপ্তি নাই, পাতাল খুঁজেও তৃপ্তি নাই।—বৃন্দাবন ছাড়া কি প্রেমরত্ন পাওয়া যায়? প্রেমের চির নিকেতন যে বৃন্দাবন।—তাই বুঝি বৃন্দাবন খুঁজে বেড়াচ্ছে—

'খোঁজ, খোঁজ, খুজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।'

রাসমণি শুনছেন—গানের সুর আর কথার ঝঙ্কার, সুধাঝরা গলার আবেদন—রাসমণি কোন অপার্থিব লোকে চলে গেলেন।

কে গায় অমনি করে—যেন বুক নিঙড়ান কান্না—যেন আকুল জিজ্ঞাসা—কে আবার!—ছোট ভটচায!

ছোট ভটচায! রাসমণি চুপ করে ভাবেন। যে মনে এত

পিপাসা সে মন তো সাধারণ নয়।—

ছোট ভটচায সাধারণ নয়। রাসমণি বুঝলেন দিব্য পুরুষ। হয়ত বা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মর্ত্তধামে আগমন করেছেন।

মথুরানাথকে বললেন,—ছোট ভটচাযকে মন্দিরে কাজ দাও। মথুরানাথ গেলেন রামকুমারের কাছে। রামকুমার ভাবেন গদাধর কি পারবে? যে উদাস যে ভোলা মন। কিন্তু হলে ভাল হয়। দিনে দিনে বৃদ্ধ অশক্ত হয়ে পড়ছেন—গদাধর যদি মন্দিরের কাজ করে—তবে যেমন নিশ্চিন্ত হবেন গদাধরের জন্য, তেমন হবেন সংসারে জন্য।

—গদাই, মন্দিরে কাজ করবি?

—গদাধর মুখ তুলে তাকায়। মুহূর্ত্তে মুখের বিষণ্ণতা কেটে যায়, চোখে ফুটে ওঠে আগ্রহ। কিন্তু সে ঐ মুহূর্ত্তেরই জন্য, আবার চোখে নেমে আসে উদাস স্বপ্ন।

গদাই চুপ করে থাকে।

রামকুমার ভাবেন হয়ত কামারপুকুরে মায়ের কাছে যাবার জন্য মন কেমন করে।

রামকুমার চারদিক বিবেচনা করে মন্দিরের বেশকারীর পদটি গদাধরকে দিতে বললেন।

মথুরাবাবু বললেন,—আচ্ছা।

রাণী বললেন,—নিশ্চয়।

গদাধর মন্দিরের বেশকারী।—কিন্তু কাজ করবে কি—বক বক করে কি সব বলে—কখন বা দেবী ধমক দেয়, কখন বা আবদার করে—নিজের ইচ্ছামত বেশ মাকে পরিয়ে দেয়। তবুও মনে হয় মা যেন হাসেন, গদাধরের কাজে কৌতুক অনুভব করেন। যেন স্নেহ ফুটে ওঠে মায়ের নিথর চোখের কোণে।

আর কেউ না বুঝলেও—আর কারও চোখে ধরা না পড়লেও রাসমণির চোখে ধরা পড়ে—মথুরামোহন যেন বোঝেন। মথুরা-মোহনের কাছে নালিশ যায়, রাসমণির কাছে নালিশ যায়। ছোট ভটচায কোন নিয়ম মানে না। যা খুশি তাই করে।

মথুরামোহন বলেন,—করুক।

রাণী বলেন—কেউ বাধা দিওনা।

রামকুমার গদাধরকে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষা দেবার কথা ভাবলেন। —শক্তি মন্ত্রে দীক্ষা না পেলে শক্তি পূজার অধিকার হয় না। আজ গদাধর বেশকার কাল যে পূজারী হবে না কে বলতে পারে। তার উপরে আছে মথুরামোহন আর রাণীর স্নেহ। রামকুমার ঠিক করলেন গদাধরকে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে রাখা ভাল।

রামকুমার কেনারাম ভটচাযকে ধরলেন। গদাধরকে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষা দিতে হবে।

কেনারাম রাজি হলেন।

গদাধর? গদাধর কি বললেন,—তিনি তো এক পায়ে খাড়া।

রামকুমার ভাইকে দেবী পূজা, চণ্ডীপাঠ যত্ন করে শেখাতে লাগলেন। গদাধরের স্মরণ শক্তি ছিল। দাদা একবার যা বলে দেন গদাধরের মনে থাকে, দুবার বলতে হয় না। সুন্দর পরিপাটি করে কাজ করেন। রামকুমার যা ভেবেছিলেন তাই হলো।

গদাধর পূজারী হলেন। রামকুমার খুব সময় মত গদাধরকে সব শিখিয়ে রেখে গেছেন। শক্তি বড় জাগ্রত—কোন অনাচার হলে দেবীর কোপ পড়ে।

রামকুমার এবার নিশ্চিন্ত। গদাধরের জন্য নিশ্চিন্ত। সংসারের জন্য নিশ্চিন্ত।

মথুরামোহন নিশ্চিন্ত, সাধক ভক্তের হাতে দেবীর ভার দেওয়া হয়েছে।

রাণী নিশ্চিন্ত—দেবী রোজ তাঁর পূজা গ্রহণ করবেন।

ক'দিন না যেতেই রাণীর কাছে নালিশ যেতে লাগল। ছোট ভটচায কিছু জানেন না, নিয়ম-রীত কিছুই মানেন না। দেবীর সামনে বসে কখন কাঁদেন—কখন হাসেন—কখন হাত তুলে মারতে যান, আপন মনে বিড় বিড় করেন।

রাণী বললেন—ঠিক আছে।

মথুরামোহন বললেন,—ছোট ভটচায যা করছে করুক। কেউ কিছু বলবে না।

গদাধরের কাণ্ড—ঠাকুরের লীলা সাধারণ লোকের বুঝবার শক্তি নাই। লোকে মনে করে পাগলামি, কিন্তু এ যে মহাভাব তা বুঝবে কি করে! গদাধর এখন নিজের মনে নিজের খেয়ালে থাকেন। মূর্তির সামনে বসে কখন গানের পর গান গেয়ে চলেছেন—হুঁশ নাই। হুঁশ থাকে না পরিধেয় বস্ত্রের।—কেমন যেন হয়ে গেছেন।

বিজ্ঞ লোকেরা মাথা নেড়ে বলেন,—হবে না। শক্তিপূজা কি এতই সহজ। এত অনাচার মা সইবে কেন? পাগল করে দিয়েছেন।

শুনে মথুরাবাবু চুপি চুপি দেখে গেলেন। যাবার সময়ে বলে গেলেন—ছোট ভটচাযকে কেউ কিছু বলোনা। যা ইচ্ছে করুক, বাধা দিও না।

রাণী এবার আবার বৈষয়িক বিষয়ে মন দিলেন। বড় মেয়ে পদ্মমণির সঙ্গে সব সময় বনিবনা হয় না। পদ্মমণি মায়ের সব কথা শুনতে চান না বা রাখতে চান না। দানপত্রে যদি সব উত্তরাধিকারির স্বাক্ষর না থাকে তবে দানপত্র পাকা হবে না।

রাণীর জীবনস্বত্ব মাত্র দানের অধিকার। ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারির স্বাক্ষর তাই দরকার!

পদ্মমণি এবিষয়ে মায়ের অবাধ্য হলেন। রাণীর এত সাধের দক্ষিণেশ্বর—সে দক্ষিণেশ্বরের দানপত্রের দলিলে পদ্মমণি স্বাক্ষর করেন নি। দানপত্র পাকা হতে পারেনি। রাণীর অন্য মেয়ে জগদম্বা মার

খুব বাধ্য। তিনি স্বাক্ষর দিতে ইতঃস্তত করেননি। রাণীর মৃত্যুর পরে পদ্মমণি এজন্য কোর্ট কাছারি পর্যন্ত করেছেন।

রাণীর এই এক মহা অশান্তি ছিল। তাই তিনি শান্তি পাবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে ছুটে যেতেন।

গদাধর গান শোনাতেন—

ওগো আনন্দময়ী হ'য়ে মা আমায় নিরানন্দ করো না,

(ওমা) দুটি চরণ বিনে আমার মন অন্য কিছু আর জানে না।

ছোট ভটচায—গদাধরের গানের সুধায় রাণীর মনের ক্ষতে প্রলেপ পড়ে। যখনই মনে ভার জমে ওঠে—রাণী ছোট ভটচাযের কাছে ছুটে যান। ভারমুক্ত হয়ে ফিরে আসেন।

রামকুমার অশক্ত হয়ে পড়লেন। এখন শুধু রাধা-গোবিন্দের পূজা করেন। কালী পূজা করে গদাধর।

মথুরবাবুর আপত্তি নাই। রাণী অনুমোদন করেন।

বেশকারী গদাধর এখন পূজারী—মন্দিরে একজন নতুন বেশকারী চাই। রামকুমার ভাগনে হৃদয়কে আনালেন।

হৃদয় মানে গদাধরের হৃদে—ঠাকুরের হৃদে।

বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। কিন্তু গদাধরকে বড় ভালবাসে। তা বলে কড়া কড়া কথা শুনাতেও ছাড়ে না।

কালী পূজায় সময় লাগে। রামকুমারের অশক্ত শরীরে বড় কষ্ট হয়। তাই এবার থেকে এ বন্দোবস্ত হলো।

রামকুমারের বড় ইচ্ছা কিছুদিন বাড়ি থেকে ঘুরে আসেন। কিন্তু সে ইচ্ছা আর পূরণ হয়নি।

মন্দির প্রতিষ্ঠার একবৎসর পরে রামকুমার দেহত্যাগ করেন। গদাধর বড় আঘাত পেল।

রামকুমার ছিলেন গদাধর থেকে সাইত্রিশ বৎসরের বড়। দাদার স্নেহে বিদেশে এসেও গদাধর স্নেহের নীড়ে ছিলেন। দাদার স্নেহের কত নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। কিন্তু তিনি নাই। গদাধরও আঘাত পায়।

মন্দির প্রতিষ্ঠার একবৎসর পরে রামকুমার মূলাজোড়ে যান—সেখানেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

দাদার মৃত্যুতে গদাধর যেন আরো উদাস হয়ে পড়লো। মাঝে মাঝে লাফিয়ে—এবার চণ্ডাল যবন আদি করি কাকেও বাকী রাখব না—বলে চেঁচিয়ে ওঠে।

লোকে ভাবে দাদার শোকে ছোট ভটচায্ হয়ত এবার পুরো পাগল হয়ে গেল।

ক'দিন পরে গদাধরের আরো পরিবর্ত্তন দেখা দিল। বিশ্ব সংসার ভুলে জগদম্বার পূজায় মন প্রাণ ঢেলে দিল। পূজা শেষ হয়ে যায় কিন্তু তন্ময়তা কাটে না। নিজের মনে বসে বসে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, কবীর—মায়ের ভক্তদের গান গাইতে থাকেন। আত্মহারা হয়ে যান।

হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে উঠলেন—কথা বলা প্রায় ছেড়েই দিলেন। পূজার পরে, দুপুরে ও রাত্রিতে পঞ্চবটীর পাশে জঙ্গলে বসে ধ্যান করেন। রাণী রাসমণির কাছে খবর যায়, মথুরাবাবু শোনেন। রাণী কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করেন।

মথুরাবাবুর কড়া হুকুম ছোট ভটচায্ যা করে করুক। মন্দিরে অন্য যারা আছেন তাঁদের ভাল লাগে না। লাগবে কি করে; তাঁদের তো আর রাণী রাসমণি আর মথুরামোহনের দৃষ্টি শক্তি নাই। বাইরের আচার নিষ্ঠাটাই তাদের বড়। অন্তরের সঙ্গে যোগ নাই। যেন আচার নিষ্ঠাতেই দেবী তুষ্ট হন—অন্তরের আবেদন কিছু না।

কেউ কেউ ভাবেন ঠিক আছে, পাগলকে প্রশ্রয় দিচ্ছে—পরে বুঝবেন এখন। কেউ বা ভাবে বড়লোকের খেয়াল। কেউ বা ভাবে খুব কপাল করে এসেছে ছোট ভটচায্।

বাইরের লোক তো ভাববেই—গদাধরের ভাগ্নে হৃদয়, তারও এসব ভাল লাগে না।

মামা পঞ্চবটীর বনে ধ্যানে বসলে ঢিল ছুঁড়ে ভয় দেখাত। ভাবত

যদি ভূতের ভয়ে জঙ্গলে না যায়। যেন ভূতেরা ঢেলা মারতে পারে!

হৃদের ধারণা মামা পুরো পাগল না হলেও হবেন। বেশী দেরী নাই। মামার সব কাজেই হৃদে পাগলামির লক্ষণ দেখতে পায়। মামাকে সামলে নিয়ে চলতে চেষ্টা করে। না হলে যে কবে কে যেয়ে সেজবাবুর কানে তুলে দেবে—ব্যাস, মন্দিরের কাজটি যাবে? হৃদয় ভয় দেখাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। একদিন গদাধর পঞ্চবটীর বনে গেলেন। হৃদে গেল পিছে পিছে। ঢুকবার সাহস নাই। মামাকে ভুতের ভয় দেখালেও নিজের কিন্তু সে ভয়টা বেশ ভাল রকমই ছিল।

হৃদয় বাইরে দাঁড়িয়ে উঁকি মারল।

কি সর্ব্বনাশ, যেটুকু বাকী ছিল সেটুকুও এবার পুরো হলো! হৃদয় ঠিক করে ফেলল—আর পারা গেল না, মামা এবার ঘোর উন্মাদ। না হলে কেউ এ রকম করে এই রাত্রি বেলা ধ্যানে বসে?

গদাধর বসে আছেন আমলকী গাছের নিচে। দিগম্বর—পৈতে কাপড় সব খুলে ফেলে দিয়েছেন।

গদাধর চোখ বুঝে আছেন—যেন পাথরের মূর্ত্তি।

হৃদয়ের মহা দুশ্চিন্তা, শেষ পর্য্যন্ত মামা একেবারে পাগল হয়ে গেল! এমনি করে ফেলে তো আর চলে যাওয়া যায় না। শত হলেও মামাতো—ভালমন্দ হলে তাকেই তো দেখতে হবে।

—ও মামা, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি—হৃদয় এসে জিজ্ঞাসা করে। এ কোন ধারা ধ্যানে বস তুমি? করবে তো ঠিক করে কর। সভ্য ভব্য হয়ে বস।

—তুই এসবের কি বুঝিস? গদাধর বললেন,—জাত, অভিমান, ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান—এই আট পাশে মানুষ বাঁধা থাকে। পৈতেটাও 'আমি বামুন' সব চেয়ে অহঙ্কারের বড় চিহ্ন হলো এগুলো। এসব ফেলে দিয়ে—পাশ আর অহং মুক্ত হয়ে মাকে ডাকতে হয়, তবে মা ডাক শোনেন। তুমি অহঙ্কারে ফুলে

থাকবে, আট পাশে তোমার দেহ মন জড়িয়ে থাকবে—মা তোমার ডাক শুনবেন কেন? আমি সব খুলে ফেলে দিয়েছি। মাকে পেলে আমি আবার সব পাব।

মামা বলে কি!—হৃদয় অবাক—মামার কাণ্ডগুলি পাগলের মত হলেও কথাগুলি তো নয়! হৃদয় মামাকে বকবে কি! এসেছিল আচ্ছা করে বকুনি দিতে। কিন্তু বকবে কি, হৃদয় অবাক! মামাকে যা ভাবত বা লোকে যা বলে হয়ত তা নয়। আবার হতেও বা পারে—পাগলেরাও মাঝে মাঝে তাক লাগানো কথা বলে বসে।

হৃদয়ের মহা সমস্যা!

ক্রমে গদাধরের দিব্য উন্মাদ অবস্থা হলো। উন্মাদের মত আচরণ কিন্তু উন্মাদ নয়। আচার নিষ্ঠা নিয়ম রীতি পার হয়ে গেছেন। পূজোয় বসেন, কিন্তু শাস্ত্র মত কিছু করেন না। করেন নিজের ইচ্ছা মত।

গদাধরের এ ভাব বাড়তে লাগল। চারিদিকে একথা প্রচার হয়ে গেল। ছেলে যেমন মায়ের সঙ্গে ব্যবহার করে—গদাধরের পূজাও যেন তাই। যে ফুল দিয়ে ইচ্ছা যে রকম করে ইচ্ছা মাকে সাজায়, আবার খুশি হলে সব খুলে রেখে দিয়ে মা'কে আবার সাজাতে বসে যায়। কখন বা ঝগড়া করে—কখন করে অভিমান। রাগ করে হাত তোলে, আবার কাঁদতেও বসে। কখনও বা মাতালের মত টলতে টলতে পূজার আসন ছেড়ে উঠে পড়ে। শ্রীশ্রীজগদম্বাকে আদর করে। কথা বলে। তারপর হয়ত হাত ধরে নাচতে থাকে।

মাকে অন্ন ভোগ নিবেদন করা হয়েছে। ভাত নিয়ে দেবীর মুখের কাছে নিয়ে বলেন, খা-খা—তাড়াতাড়ি কর। বলে একটু পরে সেগুলো নিজেই খেয়ে ফেলেন।—কি বলছিস? আমি খাব—আচ্ছা তাহলে খাই। কিছুটা খেয়ে আবার বলে ওঠেন, 'এইত আমি খেলাম, এবার তুই খা। খাবার সবই তো তোর জন্য পাঠিয়েছে।

মথুরানাথ এসে মাঝে মাঝে দেখে যান। ঠাকুরের দিব্য উন্মাদ অবস্থা—দিব্য জ্ঞানে ঠাকুর উন্মত্তের মত।

লোকে তা বুঝবে কেন! ওদের তো সে জ্ঞান নাই। রাণী বোঝেন আর বোঝেন মথুরানাথ। তাঁরা বুঝলেই হলো।

ঠাকুরের লীলা প্রকট হবে মর্ত্তে—অষ্টশক্তির একশক্তি রাণী হয়ে এসেছেন—তিনি বুঝবেন না তো কে বুঝবে? সাধারণ লোকের কতটুকুই বা জ্ঞান!—মোহে অন্ধ, দর্পে কুটিল, লোভে অস্থির। তারা ভাবে—না, আর চুপ করে থাকা যায় না, একি অনাচার! পাগলা নিজে তো মরবেই, দেবীর কোপে আমরাও মরব।

ছুটে গেল মথুর বাবুর কাছে।

মথুরানাথ চুপ করে সব শুনলেন।

একদিন রাত্রিতে ঠাকুর শুয়ে আছেন দেবীর সিংহাসনের পাশে।

একি! দেবীকে না শুইয়ে মামা শুয়ে আছে—হৃদয় এবার ভয় পেল, এত ভয় আগে পায়নি।

কান পেতে শুনল মামা কি বলছে।

—কি বলছিস, আমায় শুতে বলছিস? আচ্ছা শুই।

একি কথা!—কার সঙ্গে কথা বলছে? হৃদয়ের কেমন যেন ভয় ভয় করে।

কোনদিন বা গদাধরের বাহ্য জ্ঞান থাকে না—পূজা করবে কি? জ্ঞান হারিয়ে দেবীর পায়ের কাছে পড়ে আছে।

হৃদয় সংসারী লোক। ভাবে এসব কথা রাণীর কানে গেলে মামাকে আর এখানে কাজ করতে হবে না। রাণী যে সব জানেন, সে কথা হৃদয় জানে না! রাণী কে সে কথাও তার জানা নাই।

যতটা পারে হৃদয় ঢেকে ঢুকে রাখে।

কিন্তু আগুন কি ঢাকা থাকে?

আগে তবুও মাঝে মাঝে এ রকম হতো। এখন যে সব সময়-ই এ রকম।

চারদিকে শুধু এক কথা—গেল গেল, ভটচায্ সব নষ্ট করে দিল। দেবীর পূজা, ভোগ, রাগ কিছু হয় না। ছোট ভটচায্ ম্লেচ্ছের মত কাণ্ড আরম্ভ করেছে।

যদিও রাণী সব জানেন—সব বোঝেন,- তবুও লোকাচার আছে তো? প্রতিদিন এত নালিশ, এত অনুরোধ চুপ করে থাকলেই বা কি করে চলে? লোকে বলবে রাণীর পক্ষপাত। লোকে বলবে রাণীর ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি নাই—সবই লোক দেখান।

বলে পাঠালেন—লোক যাবে।

সবাই খুশি। এবার বেশ হবে। একবার এসব অনাচার চোখে দেখে যান। তারপর বুঝুন—ছোট ভটচায্ কেমন। এত যে বলা হচ্ছে সেকি শুধু শুধু অমনি? গদাধর তো আর তাদের শত্রু নয়। ছোট ভটচায্কে তারাও ভালবাসে। কিন্তু কি করবে বল! দেবীর পূজা তো আর ছেলে খেলা নয়!

মায়ের সঙ্গে ছেলের ব্যবহার,—সে কথা তারা কি বুঝবে?—কথা মনে করে পাগলের প্রলাপ।

হৃদয় নিজে মামাকে যাই ভাবুক না কেন, বাইরের লোক মামাকে ছোট দেখবে একথা হৃদয় শুনতে রাজি নয়।—এমনিতেই তার মুখের লাগাম কম।—তার উপরে রাগ! বেশ কড়া কড়া কথা সবাইকে শুনিয়ে দিল।—কিন্তু মনে মনে ভাবে—না, মামাকে নিয়ে আর পারা গেল না। কাজটি এবার যাবে।

মামার তো বাহ্যজ্ঞান নাই। সব সময় ভাবে বিভোর।—ক্ষুধা তৃষ্ণা, ছোট বড়, কিছু জ্ঞান নাই। নিজের পরবার কাপড়টুকু পর্যন্ত ঠিক থাকে না।—হৃদয়কে সামলে দিতে হয়।—কিন্তু তার মধ্যেই যে-সব কথা বলে সে-সব শুনলে তাক লেগে যায়।—কখন কখন প্রশ্নের উত্তরে এমন সব কথা বলে যে অবাক হয়ে যেতে হয়।

মথুরাবাবু এলেন।—কাউকে না জানিয়ে চুপি চুপি এলেন।—উদ্দেশ্য সত্যি ছোট ভটচায কি করে দেখে যাওয়া!

ঠাকুর ভাবে বিভোর।—কে আসে কে যায়, কারা আছে তাঁর চারদিকে—দিন কি রাত কিছুই জ্ঞান নাই। দেবীর সিংহাসনের কাছে বসে ছেলের মত আবদার করছেন।—অভিমান করছেন!—কখন ধমক দিচ্ছেন। কখন কাঁদছেন।—কথা বলছেন দেবীর সঙ্গে, ঠাকুরের কথা কানে ধরা পড়ে কিন্তু দেবীর উত্তর শুনবে কি করে?

মথুরামোহন স্তম্ভিত—মথুরামোহন মুগ্ধ। দিব্য ভাবের কথা শোনা ছিল। কিন্তু দেখেননি কখনও।—কিন্তু চিহ্ন সব মিলে যাচ্ছে।

মথুরামোহন শিক্ষিত ইংরাজী নবীশ হলেও—দেব দ্বিজে ভক্তি ছিল অচল। মুগ্ধ স্তম্ভিত আত্মবিস্মৃত মথুরামোহন দাঁড়িয়ে আছেন। এদিক ওদিক কর্মচারীরা কান খাড়া করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ বা কাজের অছিলায় বার বার আসা যাওয়া করছে।—আজ যা হয় একটা কিছু হয়ে যাবে। সেজবাবু একেবারে চাক্ষুস দেখছেন।—হৃদয় কাঠ হয়ে আছে। মামার কাজটুকু এবার গেল! তার কাজও থাকবে না। মন্দিরের সবাই তো জোট বেঁধেছে।

মথুরামোহন চুপ করে এসেছিলেন। কপালে হাত ঠেকিয়ে তেমনি চুপ করে চলে এলেন।

কর্মচারীরা অবাক! একি, সেজবাবু যেমন এলেন তেমন গেলেন! ছোট ভটচাযকে কিছু বললেন না। যাবার সময় আবার ভক্তি করে নমস্কার জানিয়ে গেলেন। এঁরাও পাগল হলেন নাকি?

রাণী সব শুনলেন। মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রণাম জানালেন। এত দিনে মার প্রতিষ্ঠা সার্থক হলো! এবার দেবীর সত্যিকার পূজা হচ্ছে।

রাসমণির মনে আনন্দের জোয়ার এলো, ভক্তির বান ডাকল। ধন্য ছোট ভটচায্, ধন্য সাধক গদাধর—তোমার টানে মা নিজে নেমে এসেছেন—পাথরের মূর্ত্তি হয়েছে জাগ্রত।

কর্মচারীদের উপরে আবার কড়া আদেশ গেল—ছোট ভটচায্ যা খুশি করবে, কিন্তু সাবধান, তাঁর কাজে বাধা দিও না। তাঁকে বিরক্ত করো না।

কর্মচারীরা অবাক। এযে উল্টা বুঝলি রাম! যাক গে—আমাদের আর কি! জমিদারের অন্ন খাই, আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করেছি। এবার বোঝ তোমরা। যা করতে বলবে করব। না হলে পরে যে বলবে কেন জানান হয়নি—কে দেবে কৈফিয়ৎ!

হৃদয় অবাক। একি হলো! কোথায় হুকুম আসবে মন্দির ছেড়ে চলে যাও—এযে উল্টো হুকুম! সেজবাবু তো সব নিজের চোখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে গেছেন। তবে? হয়ত তাহলে মামাকে যা ভাবি তা নয়। মথুরবাবু ইংরাজী নবীশ শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক। অনেক জানেন, এতবড় জমিদারী চালাচ্ছেন, কারবার চালাচ্ছেন—তাঁর চোখে ধুলো দেয়া তো সহজ কথা নয়। আর তাছাড়া মামার আর যা দোষ থাকুক—এ দোষটি আছে সে কথা তাঁর শত্রুও বলবে না। কোন ঘোর প্যাঁচের মধ্যে মামা নাই। একেবারে খোলা মেলা। তাইত! হৃদয় ভাবে, বিষয়টা কি! রাণী আর সেজ বাবুর মামার উপর যেন ভক্তিটা বেড়েই গেল। কি ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে একথাটা হৃদয় ঠিক বুঝেছে, মামাকে এ মন্দির থেকে আর কেউ সরাতে পারবে না। নালিশ করতে গেলে উল্টা ফল হবে। তা এক রকম মন্দ হলো না। এবার কেউ কিছু বলতে এলে বেশ করে দু'কথা শুনিয়ে দেয়া যাবে।

হৃদয়ের জিভ যেন সুর সুর করে উঠল।

রাণী রাসমণি ছিলেন অসামান্যা—মথুরবাবু বুদ্ধিমান—দেব দ্বিজে বিশ্বাসী। ছোট ভটচাযের সাধক রূপ তাঁরা চিনেছেন। লৌকিক ন্যায় অন্যায়গুলি অলৌকিক সাধন ক্রিয়া বলে বুঝে নিয়েছেন।

রাসমণি পৃথিবীতে এসেছেন ঠাকুরের সাধন পথে সহায় হতে। তাই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিলেন, সাধন পথের বাধা সরিয়ে দিলেন। ঠাকুরের চরম সিদ্ধি লাভে রাণী রাসমণি ছিলেন অন্যতম সহায়।

সমস্ত জগৎ আজ রাণী রাসমণির নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। ঠাকুরের মর্ত্তলীলার সহচরী হিসাবে তিনি অমর হয়ে আছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নাম রাখিবার কাল এল দিনে দিনে।
কি নাম রাখিবে পিতামাতা ভাবে মনে॥
গয়াধামে গদাধর করি দরশন।
পাইলেন কোলে হেন কুমার রতন॥
সেই হেতু রাখিলেন নাম গদাধর।
ডাকেন গদাই বলি করিয়া আদর॥
গুরুদত্ত নাম রামকৃষ্ণ নাম খ্যাত।
রামকৃষ্ণ পরমহংস ভুবনে বিদিত॥

দক্ষিণেশ্বরের সিদ্ধপুরুষ—জগৎ সংসারের ত্রাণকর্ত্তা ছোট ভটচায হলেন রামকৃষ্ণ।

হলেন কি করে? গদাধর—ছোট ভটচাযকে কে দিল এ নাম? কেউ বলে এ, কেউ বলে ও, কেউ বলে পরমভক্ত মথুরানাথ।

ছোট ভটচাযের নাম দিলেন কৃষ্ণ। শুধু কৃষ্ণ কেন। আগে বসালেন ভটচায বাড়ির রাম নাম—হলেন রামকৃষ্ণ।

রাম শব্দটি না হলে ভটচায বাড়ির নাম রাখা হয় না—

মানিকরাম, ক্ষুদিরাম, রামশীলা, নিধিরাম, রামকানাই, রামচাঁদ, রামতারক, রামকুমার, রামেশ্বর, রামলাল, শিবরাম—তাই গদাধর হলেন রামকৃষ্ণ।

রাণী রাসমণির কাগজপত্রে লেখা রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। ঠাকুরও সে কথা বলেন—মথুরবাবু লিখতেন রামকৃষ্ণ। বিশ্বাস না হয় রাণীর বরাদ্দ লিপি দেখ—

১২৬২ সাল ১৮৫৮ খৃঃ

শ্রীশ্রীকালী—	কাপড়
শ্রীরামতারক ভট্টাচার্য্য—৫৲	রামতারক ৩ জোড়া—৪॥৹
শ্রীরাধাকান্তজী—	রামকৃষ্ণ ৩ জোড়া—৪॥৹
শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—৫৲	হৃদয়রাম ৩ জোড়া—৪॥৹
পরিচারক—	খোরাকী সিদ্ধ চাউল ⁄॥৹
শ্রীহৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়—৩॥৹	ডাল ⁄৵৹ পোঃ পাতা ২ খানি,
	তামাক ১ ছটাক, কাষ্ঠ ⁄২॥৹

লোকে বলে নাম দিয়েছেন তোতাপুরী।

তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে আসেন বাঙ্গালা ১২৭১ সালে। বরাদ্দ লিপিতে রাসমণি স্বাক্ষর করেন ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী—বাঙ্গালা বছর ১২৬৭ সাল। আরো আগে ১২৬২ সালে ঠাকুর যখন রাধাকান্তজীর মন্দিরের পূজারি তখনও রাণীর কাগজে লেখা—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

কেউ বা বলে ভৈরবী নাম দিয়েছে রামকৃষ্ণ।

১২৬৮ সালের কথা।

ছোট ভটচাযের প্রায় উন্মাদ অবস্থা। জলে গলা ডুবিয়ে বসে থাকেন—গায়ে জ্বালা। রাণীর জামাই মথুরবাবু ঠাকুরের চিকিৎসা করালেন। গঙ্গাপ্রসাদ সেন বললেন—সারাবার চেষ্টা করব—মারাত্মক বায়ু রোগ।

দক্ষিণেশ্বরে এলেন ভৈরবী।

গৈরিকবসনা ব্রহ্মচারিণী ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী। ঠাকুরের তন্ত্রসাধনার আধার—ছোট ভটচায বসে আছেন। পাগল মানুষ নিজের খেয়ালেই বসে থাকেন—ধ্যানে বসেন, গান করেন। কিন্তু কোন অনিষ্টের মধ্যে নাই।

ভৈরবী এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে মথুরবাবু।

পাগল! কে বলে পাগল? ভৈরবী মথুরবাবুকে বললেন, কে

বলে বায়ুরোগ? এ তো দেখছি মহাভাব। এ ভাব সকলের হয় না। হয়েছিল শ্রীরাধার? হয়েছিল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আর হয়েছে এঁর—ইনি অবতার। ভৈরবী স্থান কাল ভুলে—

"করতালি দিয়া মাগী নেচে নেচে বলে।
এইত গৌরাঙ্গ দেব নিতায়ের খোলে॥
হৃদয় আনন্দময় তাহার উচ্ছ্বাসে।
যথা তথা পুরীমধ্যে এই বার্ত্তা ঘোষে॥
এই রামকৃষ্ণ সেই গৌর গুণধাম।
সাব্যস্ত সহস্র দেয় শাস্ত্রের প্রমাণ॥"

রামকৃষ্ণের ইতিহাস আছে কিন্তু নাম প্রাপ্তির ইতিহাসে গোলমাল। কেউ বলেন তোতাপুরী, কেউ বলেন ভৈরবী, কেউ বলেন ক্ষুদিরাম, কেউ বলেন ভক্ত মথুরানাথ।

মথুরানাথ শিক্ষিত। ঠাকুরের ভক্তরা শিক্ষিত। যাচাই না করে বিশ্বাস করে না। বিবেকানন্দ ছ'বছর যাচাই করেছেন।

মথুরানাথ ভাবেন, মা'র যেমন খেয়াল! দেশে আর লোক ছিল না।

ছোট ভটচায মিটি মিটি হাসেন।

জানিস ভগবান ইচ্ছা করলে সব কিছু করতে পারেন।

ছোট ভটচায তুই তোকারী করে কথা বলেন। আপনি তুমির ধার ধারেন না, বিরক্ত হলে বলেন শালা! ছোট বড় কাউকেই ছাড়েন না।

মথুরবাবু বললেন—আপনার ভগবান ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন?

হ্যাঁ।

বেশ! একটা টকটকে লাল জবা গাছ। ফুলে ফুলে ভরে গেছে। পাতা দেখা যায় না। মথুরবাবু বললেন—এ গাছের একটা ডালে এই লাল জবার সঙ্গে সাদা জবা ফুটাতে পারেন? মথুরবাবুর মুখে মুচকি হাসি। ভাবটা যেন, কেমন এবার?

কি বলেন ? বলে দেখুন না আপনার ভগবানকে ।—মথুরবাবু বললেন, কাল দেখতে পাবতো ?

পাবিরে শালা পাবি । কাল ভোরে আসিস । ছোট ভটচাযের গলা দ্বিধা শূন্য । মথুরবাবু চলে গেলেন ।

অবিশ্বাসী মনে কোথায় যেন একটা ধাক্কা লাগল । কাল ভোরে এসে কি দেখবেন মথুরবাবু জানেন । কিন্তু ছোট ভটচায তো মিথ্যে কথা বলেন না । নিঃসন্দেহ না হয়ে কিছু বলেন না । লোকটি বড় খাঁটি ।

পরের দিন ভোর হতে মথুরবাবু ছুটে এলেন ।

মনে ছিল সারা রাতের সংশয় । ভোরে যেয়ে কি দেখবেন ! জ্ঞান শিক্ষা বলে, আবার কি ! যেমন আছে তেমনই দেখবে । কিন্তু—

বিশ্বাস বলে, ছোট ভটচায তো মিথ্যে কথা বলেন না । সত্যাশ্রয়ী শুভঙ্কর—সদানন্দ পুরুষ । কি করে এ অসম্ভব কথাকে এত জোর দিয়ে বলছেন !

মথুরবাবু জবা গাছের কাছে এসে দাঁড়ালেন ।

একি স্বপ্ন দেখছেন নাতো ? চোখ রগড়ে নিয়ে আবার দেখলেন । —না, একই দৃশ্য ।

কাছে গিয়ে ভাল করে দেখেন—না কোন ভুল নাই ।—এক বোঁটায় দুটি ফুল, একটি লাল—একটি সাদা ।—ঐ একটি বোঁটাতেই । অন্যগুলিতে আগের মত লাল ফুল । কিরে শালা, ছোট ভটচায বলেন—দেখলি, ভগবান পারেন কিনা ? যা শালা অবিশ্বাসী, ভাগ ।

মথুরবাবু ছোট ভটচাযের পায়ের ধুলো নিলেন ।

দক্ষিণেশ্বরে থাকেন রামকৃষ্ণ । মথুরবাবুর রামকৃষ্ণ, না তোতা-পুরীর রামকৃষ্ণ, না ভৈরবীর রামকৃষ্ণ, না ক্ষুদিরামের রামকৃষ্ণ—জানিনা কিন্তু আমরা জানি আমাদের রামকৃষ্ণ ।

তাঁর যা কিছু দরকার মথুরবাবু আছেন, রাণী আছেন । ছোট ভটচাযকে তাঁরা ইষ্টজ্ঞান করেন ।

ভাবেন, তাইতো যদি হঠাৎ একটা কিছু হয়ে যায়। ভবিষ্যতের কথা কে জানে। আমাদের অবর্ত্তমানে তাহলে ছোট ভটচাযের কি হবে? ঠাকুর কষ্ট পাবেন।

এ হতে পারেনা। ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতে হবে।

দশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি ঠাকুরের নামে দলিল করে মথুরবাবু গেলেন দানপত্রটি নিয়ে।

ঠাকুর বাঁশ তুলে তাড়া করলেন—তবে রে শালা, আজ তোর মাথা গুঁড়ো করে ফেলব। আমাকে বিষয়ী করতে এসেছিস। দাঁড়া—।

মথুরবাবুর লোকজন হাঁ হাঁ করে উঠল।

মথুরবাবু হাত তুলে তাদের থামিয়ে দিলেন।

দলিলটিকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন।

এ লোককে দান করতে এসেছেন! যিনি নিজের দেহ, মন, প্রাণ সব বিলিয়ে দিয়েছেন, যিনি সংসারের ভার নিয়েছেন—তাঁর ভার নেবার অহমিকা!

ঠাকুর বাঁশ নামালেন।

—তুই আমার ভার নিয়েছিস, না আমি তোদের ভার নিয়েছি রে শালা?

এমনি করে দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে মথুরবাবুর অবিশ্বাসী মন ঠাকুর আঘাতে আঘাতে চূরমার করে দিয়েছেন।

মথুরবাবু ঠাকুরকে চিনেছেন—রাণী চিনেছেন। আর মনে করেছেন বহু স্থকৃতি ছিল, তাই এই পরম পুরুষকে তাঁরা পেয়েছেন।

জগদম্বা মথুরবাবুর স্ত্রী। অসুস্থ হলেন।

কলকাতায় হেন ডাক্তার কবিরাজ নাই—কি দেশি কি বিদেশী—মথুরবাবু আর রাণী রাসমণি দেখাননি।

কিছুতেই কিছু হয় না।

মা'য়ের প্রাণ, স্বামীর মন, যে যা বলে সবই তাঁরা করেন। কিন্তু

জগদম্বার কোন উন্নতি হয় না। দিনে দিনে অসুখ বাড়তেই থাকে।

অবস্থা এমন হলো যে বাঁচবার আশা ছেড়ে দিয়ে শেষ মুহূর্ত্তের জন্য সবাই তৈরি।—কখন সে ভীষণ মুহূর্ত্তটি এসে জগদম্বার প্রাণটুকু নিয়ে যায়!

যতবারই জগদম্বার শেষ মুহূর্ত্তের কথা মনে হয়—ছোট ভটচায চোখের সামনে দাঁড়ান। রাসমণি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন। চোখ বুজলেই ছোট ভটচায এসে দাঁড়ান!

একবার দু'বার নয়, বারবার এ রকম হয়।

মুমূর্ষু পত্নিকে রেখে মথুরানাথ ছুটে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে।

—যা যা, কোন চিন্তা নাই।—দেখগে ভাল হয়ে গেছে।

মথুরবাবুকে দেখেই ছোট ভটচায আপন খেয়ালে বলে উঠলেন।

মথুরবাবু অবাক। ছোট ভটচায কি অন্তর্যামী?

বাড়ি ফিরে দেখেন জগদম্বা উঠে বসেছে।—যে জগদম্বাকে যাবার সময়ও দেখে গেছেন পাশ ফিরিয়ে না দিলে ফিরতে পারে না! কি করে এই কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে একটি লোকের শুভ কামনায় তা সম্ভব হলো!

মথুরবাবু বুঝলেন ছোট ভটচায সাধারণ মানুষ নয়। রাণী আগেই বুঝেছিলেন। এবার মথুরবাবুও নিঃসন্দেহ হলেন।

সেই ঠাকুর শ্রীমা অসুস্থ হলে কাতর হলেন।

মথুরবাবু নাই, রাণী নাই, যারা আছে তারা ঠাকুরের কৃপা পায়নি। ঠাকুর বাড়ির কর্ত্তারা ঠাকুরের জন্য মাথা ঘামান না।

ঠাকুরের সে কি চিন্তা! কোথায় পাবেন ওষুধ, কে দেবে পথ্য!

প্রাণ ঢেলে সেবা করেন শ্রীমাকে।—শ্রীমার বাবা খুশি হলেন।

—কে বলে আমার জামাই পাগল? আমার জামাই আদর্শ স্বামী। বহু ভাগ্যে আমার সারু মা এমন স্বামী পেয়েছে।

মথুরবাবু ধরেছেন জানবাজারে যেতে হবে।

হৃদয় বলছে—তা হবে না। আমার বাড়িতে পূজা—মামা তুমি চল।

ঠাকুরের মহা সমস্যা।

মথুরবাবুও ছাড়ে না, হৃদয়ও ছাড়ে না।

যখন দু'জনের কেউ ছাড়তে চায় না—তখন ঠাকুর বললেন, বেশ আমাকে নিয়ে চল এক জায়গায়, আমি স্বশরীরে উপস্থিত থাকব। অন্য জায়গায় আমি সূক্ষ্ম শরীরে যাব।

মথুরবাবু ঠাকুরকে নিয়ে চলে গেলেন।

একদিন কি খেয়াল হলো, ঠাকুর বললেন, হৃদে গঙ্গামাটি আন, শিব বানাব।

আমলকি তলায় বসে বসে আপন খেয়ালে ঠাকুর শিবমূর্ত্তি গড়ছেন। জগৎ সংসার ভুলে গেছেন, বাহ্যজ্ঞান নাই। শিবলিঙ্গ নয়, শিব ঠাকুর গড়ছেন রামকৃষ্ণ।

মথুরবাবু আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলেন সে মূর্ত্তি। মুগ্ধ হলেন। হাত পেতে বললেন। শিব মূর্ত্তি আমি নেব। আমাকে দিন।

ঠাকুর হেসে সে মূর্ত্তি মথুরানাথের হাতে তুলে দিলেন।

স্নান যাত্রার দিন।

গোবিন্দ মূর্ত্তি নিয়ে যাচ্ছেন পূজারী ক্ষেত্রনাথ।

সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। পথে ঘাটে জল।—মাটি পিছল।—কোথাও শ্যাওলা জমেছে, কোথাও বা কাদা হয়েছে।

ক্ষেত্রনাথ যাচ্ছেন গোবিন্দ মূর্ত্তি নিয়ে।

হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেলেন।—মূর্ত্তি ছিটকে গেল হাত থেকে। আছড়ে পড়ল কাদা মাটির উপরে।

হৈ হৈ করে সবাই ছুটে এলো। কি সর্ব্বনাশ!—একি অলুক্ষণে কাণ্ড। এবার ভালয় ভালয় বছর কাটলে হয়।

গোবিন্দের একটি পা ভেঙ্গে গেছে। সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

ক্ষেত্রনাথ ভয়ে দুশ্চিন্তায় কাঁপছেন।

খবর পেয়ে রাসমণি জানবাজার থেকে ছুটে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। উদ্বেগ দুশ্চিন্তায় রাণীর মন অস্থির হয়ে আছে। কাতর মুখে গাড়ি থেকে নামলেন।

ক্ষেত্রনাথ মাথা নীচু করে এসে সামনে দাঁড়ালেন।

রাণী রাসমণি রাণী—যতই যা কিছু হোক, বিবেচনা বুদ্ধি লোপ পায় না।

বুঝলেন এ একটা দুর্ঘটনা, ক্ষেত্রনাথ নিরপরাধ।—ঐ ভারি মূর্ত্তি নিয়ে এই জল কাদায় যে কেউ পিছলে পড়তে পারে।

ক্ষেত্রনাথকে কিছু বললেন না।

ক্ষেত্রনাথ রাণীর অভয় পেয়ে আরো মরমে মরে গেলেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যরা বিধান দিলেন, ভাঙ্গা মূর্ত্তির পূজা হয় না। গঙ্গায় বিসর্জ্জন দাও। নতুন মূর্ত্তি স্থাপন কর।

রাসমণির মন সে কথা মানতে চায় না।

এতদিন যাকে গোবিন্দ জ্ঞানে পূজা করলাম, তাঁকে বিসর্জ্জন দেব কি? গোবিন্দকে বিসর্জ্জন দিলে আর বাকি রইল কি!

রাসমণির মনে হলো, ছোট ভটচায কি বলেন?—তিনি জীবন্ত বিগ্রহ—পরম পুরুষ, তিনি যা নির্দ্দেশ দেবেন তাই হবে।

বৈষ্ণবাচার্যদের অভিমান হলো। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। রাণীর দেয়া মাসোহারা, সিধা—এ সবগুলিতো কম নয়।

ছোট ভটচায বললেন, পড়ে গিয়ে তোমার জামাইদের পা ভাঙ্গলে তুমি কি করতে?—একটি নতুন জামাই আনতে, না পা সারিয়ে নিতে?

তাইত!—রাসমণির উদ্বেগ দূর হলো।—ছোট ভটচাযতো ঠিক কথা বলছেন—ঠিকইতো, জামায়ের পা-টা সারিয়ে নিতাম। তাকে ত্যাগ করবার কথাতো ওঠেই না।

রাণী সকাতরে বললেন,—সারিয়ে দেবেন বাবা?—আগ্রহে রাসমণি রামকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন,—বলুন, দেবেন তো?

—দেব—ছোট ভটচায বলেন,—চল।

গোবিন্দ মন্দিরে বসে ঠাকুর গোবিন্দের পা এমন করে সারিয়ে দিলেন যে কোনখানে ভেঙ্গেছিল ধরতে পারা যায় না।

রামকৃষ্ণের শিল্প প্রতিভা ছিল অদ্ভুত।

বুড়ো কাশীনাথ নামকরা কুমার। মূর্ত্তি গড়বার সেরা ওস্তাদ। সরস্বতী মূর্ত্তি গড়া হচ্ছে। গদাধর কাছে বসে আছেন। বলে উঠলেন—হচ্ছে না তো?

—তাই! কাশীনাথ বলল,—কি হচ্ছে না?

—যা বানাচ্ছ।—গদাধর বললেন।

—বেশ তো, কিরকম হবে দেখাও দেখি।—কাশীনাথের গলায় বেশ মুরুব্বি ভাব। গদাধরের মুখে মুচকি হাসি।

—ক্যাটকেটে চোখ হচ্ছে যে গো!

কাশীনাথ মুখ তুলে তাকাল।—বলে কি—বাচ্চা ঠাকুর।—কাশীনাথের হাতের মূর্ত্তিতে খুঁত!—

—গড় দেখি—মূর্ত্তি কাছে এগিয়ে গিয়ে কাশীনাথ বলল,—দেখি তোমার মুরদ কত!—গড়ে দিল গদাধর।

ওস্তাদ কাশীনাথ অবাক। একি চোখ হয়েছে, যেন সত্যিকারের চোখ। তার ভাবটিই বা কি! আহা সত্যি যেন মা তাকিয়ে আছেন! স্নেহ মমতা ঝরে পড়ছে।

ভাঙ্গা গোবিন্দ মূর্ত্তির পা ঠিক করে দেবেন ঠাকুর—এতো ছেলে খেলা। রাণী রাসমণি—ছোট ভটচাযের পায়ের ধূলো মাথায় নিলেন।

ক্ষেত্রনাথ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল—স্নান যাত্রার মেলায় উঠল আবার আনন্দের কোলাহল। এতক্ষণ যেন স্রোতের জল আটকে ছিল এবার সব ছাপিয়ে সব ভাসিয়ে ছুটে চলল।

বাজনা বেজে উঠল। গোবিন্দ রথে উঠলেন। রাণী রাসমণি, জামাই মথুরবাবু উজ্জ্বল দৃষ্টি তুলে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন। রাণীকে দেখে জনতা চেঁচিয়ে উঠল—জয় রাণী রাসমণির জয়, জয় গোবিন্দজীর জয়—

রাসমণি জানবাজারে এনেছেন ছোট ভটচাযকে।

আত্মভোলা মানুষ—তন্ময়ভাব। কখন কথা বলেন, কখন ভাবে বিভোর হয়ে থাকেন।

মথুরবাবু, মথুরবাবুর স্ত্রী জগদম্বা, রাণী রাসমণি ছোট ভটচাযের অনুগত ভক্ত।

হালদার হচ্ছেন জানবাজার জমিদার বাড়ির পুরোহিত।

পূজো আচ্চা কি জানে সে কথা ভগবান বলতে পারেন। কিন্তু পেটভরা অহঙ্কার আছে। জমিদার বাড়ির পুরোহিত, এ কি সহজ কথা ?

হালদার মশাইর যেমন অহঙ্কার তেমন স্বভাবটি হিংসুটে, লোভটিও ছোট নয়। কোথাকার কে একটা আধ্ পাগলাটে লোক তার আবার এত খাতির ! এসব হালদার মশাইর ভাল লাগল না।

আদর যত্নের ঘটা দেখনা ! রাণী, জামাই, মেয়ে সবাই হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। কখন পাগলা কি বলে সে হুকুমটির জন্য।

অনেক চিন্তা করে হালদার মশাই ঠিক করলেন—এ সব নিশ্চয় তুক-তাকের ব্যাপার ! হতভাগা পাগলাটা শেষ পর্যন্ত পুরোহিত না হয়ে বসে। এ লোকটির জন্য প্রভাব প্রতিপত্তি সব নষ্ট হতে বসেছে। একবার সুবিধা মত বাগে পেলে হয়—তুক-তাকটা শিখে নিতে হবে।

কিন্তু সুযোগ পাওয়া মুস্কিল। একা পাওয়া যায় না। রাণী, জামাই, মেয়ে—ঘিরে আছে যেন আর কোন কাজ নাই।

হালদার মশাই ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়ায়।

একদিন সুযোগ পেল।

রামকৃষ্ণ বসে আছেন বৈঠকখানায়। তন্ময় ভাব।

সুযোগ পেয়ে হালদার তেড়ে এলো—এই বিটলে বামুন !

রামকৃষ্ণ তন্ময়।

হালদার ভাবল গ্রাহ্য করছে না।

—বটে ! হালদার রেগে উঠল। আমরা মানুষ নয়, না ! রাজা,

রাণী না হলে বুঝি কথার যুগ্যি নয়। বলল,—এই বিটলে বামুন, বল না কি করে বাগালি বাবুটাকে।

রামকৃষ্ণ উত্তর দেন না।

—কি রে, কথা শুনছিস না? হালদার বলল—একা খাবি সব? আমাদের ভাগ দিতে হবে। না হলে তোর ব্যবসার আমি গণেশ উল্টে দেব। জানিস আমি এবাড়ির পুরোহিত!

রামকৃষ্ণ কথা বলেন না—উত্তর দেন না।

—বলবিনে শালা—হালদার রাগে ফেটে পড়ল। তবে দেখ।

রামকৃষ্ণকে ধাক্কা দিয়ে মেজেয় ফেলে দিয়ে লাথি মারতে মারতে বলল—দেখ শালা, কেমন লাগে।

যাবার সময় শাসিয়ে গেল—যদি সেজ বাবুর কাছে নালিশ করেছিস কি মরেছিস। তোকে আর এখান থেকে ফিরে যেতে হবে না। মনে রাখবি, আমি হালদার ঠাকুর—আর কেউ না। তোর মত ঢের ঢের বিটলে বামুন দেখেছি।

রামকৃষ্ণ গায়ের ধূলো ঝেড়ে উঠে বসলেন।—কাউকে কিছু বললেন না।

কিন্তু কথাটা গোপন রইল না।

রাণী শুনলেন, মথুরবাবু শুনলেন।

—বাবা!—মথুরবাবু উদ্বেগ কাতর মুখে এসে দাঁড়ালেন। এ সব কি শুনছি? হালদার আপনাকে লাথি মেরেছে?—আজ ওর মাথা কেটে আদি গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব তবে আমার নাম মথুর।

রামকৃষ্ণের মুখে প্রশান্ত হাসি।

—তাইতো বলিনি সেজবাবু। যা-ই করে থাক—লোকটা রাগের বশেই করেছে।—রাগ পড়লে বুঝবে। মানুষ তো! ও রাগলো বলে কি আমিও রাগব?

মথুরবাবুর ক্রোধ শান্ত হতে চায় না।

যাকে ইষ্টজ্ঞানে ভক্তি করি তার গায়ে হাত! তার চেয়ে

আমাকে দু'ঘা দিলেও আমি ওকে ক্ষমা করতে পারতাম। বাবা, আপনি আমাকে নিষেধ করবেন না।

রামকৃষ্ণ মথুরবাবুর গায়ে শ্রীহস্ত বুলিয়ে দিলেন।

—সেজবাবু, মানুষ—মানুষ। তাকে ভালবাসাই ধর্মকর্ম—সাধন ভজন সব। শত্রুকে বশ করবে ভালবাসা দিয়ে। রাগকে দমন করতে হয় প্রেম দিয়ে। তুমি ওকে কিছু বলো না। আমি দুঃখ পাব।

মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছেন রামকৃষ্ণ।

দেওঘরে এসেছেন। বৈদ্যনাথ দর্শন করে কাশী যাবেন।

দেওঘরে তখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ।

চারিদিকে পেটের জ্বালা, চারিদিকে হাহাকার। দুর্ভিক্ষ পীড়িত সাঁওতালের দল ভিক্ষা করে।

রামকৃষ্ণ সহ্য করতে পারলেন না।

মথুরবাবুকে বললেন,—সেজবাবু, তুমি ত মায়ের দেওয়ান। এরাও মায়ের ছেলে। ওদের পেট ভরে খেতে দাও, মাথায় তেল দাও—পরবার কাপড় দাও।

মথুর বললেন,—এখন এই পথের মাঝখানে টাকা কোথায় পাব বাবা? তীর্থে চলেছি। কখন কোথায় কি লাগে কে জানে? হাতের টাকা খরচ করলে পরে হয়ত অনেক জায়গা যাওয়া হবে না।

রামকৃষ্ণ বললেন,—তবে তোমরা যাও। আমি এদের সঙ্গে থাকব। এদের মাঝেই আছেন তিনি। এদের হাত দিয়েই দেবতা পূজা নেন, এদের মুখ দিয়েই আহার গ্রহণ করেন। তোমরা যাও—আমি আমার ঠাকুরের কাছে থাকি।

মথুরবাবু মুস্কিলে পড়লেন। তারপর মনে মনে বললেন,—যা কর ঠাকুর তুমি করবে। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

মথুরবাবু সাঁওতালদের পেটভরে খাওয়ালেন, মাথায় তেল দিলেন, নগ্নদেহে বস্ত্র দিলেন।—ধন্য মথুরানাথ!

সপ্তম অধ্যায়

গদাধরের চোখে জল। মুখে আকুল নিবেদন। রাণী শুনছেন, বসে আছেন সব ভুলে। সাধকের আকুতি—এযে বিহ্বল করে তোলে।

ঠাকুর কখন গাইছেন, 'ডাক দেখি মন ডাকার মত—কেমন শ্যামা থাকতে পারে।'—এতো শুধু গান নয়।—মনের বিশ্বাস—দাবি —জোর—যা বল সবই।

যেটুকুও জ্ঞান মাঝে মাঝে দেখা দিত সেটুকুও এবার লোপ পেল। কেবল মা মা—চোখের জল শুকায় না। কখন কোথায় পড়ে যান, আগুনে পড়েন না জলে পড়েন খেয়াল নাই। এ দেহ যেন তাঁর নিজের নয়। গদাধর এখন সমস্ত কাজের বাইরে।

মন্দিরের পূজা চালানো তাঁকে দিয়ে আর সম্ভব হলো না।

জাত, অভিমান, ঘৃণা, লজ্জা, কূল, শীল, ভয়, মান—সব পাশ খুলে পড়েছে। একদিন হৃদয়কে বলেছিলেন, এই পাশ মুক্ত না হলে সিদ্ধি লাভ হয় না। ঠাকুরের সব পাশ খুলে পড়েছে।—একথা সাধারণ জ্ঞান নিয়ে কি বুঝতে পারা যায়? বিষয় বুদ্ধির দৃষ্টিতে কি ধরা পড়ে?—তাহলে আর অসাধারণ বলবে কেন?

গদাধর দেবী পূজার দিকে লক্ষ্য রাখবেন কি—এখন তাঁর যে অবস্থা তাঁর উপরেই লক্ষ্য রাখা দরকার। যদি স্নায়ু বিকার হয়ে থাকে চিকিৎসা করাতে হবে।

মথুরবাবু ভাবলেন।—ঠাকুরকে চিকিৎসক দেখান দরকার। ঠাণ্ডা জিনিষ খাওয়াতে হবে।

ছোট ভটচাযের চিকিৎসা আরম্ভ হলো। কিন্তু যার জন্য এত তিনি কিন্তু এসব কিছুই বোঝেন না। এসব অনুভব করেন না বা গ্রাহ্য করেন না। যে যা করে আপত্তি করেন না। ভাবে বিভোর,

মুখে শুধু মা মা, চোখে শুধু জল। এ পৃথিবীতে দেহ আছে কিন্তু মন নাই। মন সাধারণ বুদ্ধির আয়ত্বাধীন জগতের—বাইরে।

হৃদয়ের কাজ বেড়েছে। সারা দিনরাত মামাকে সামলে চলা—বিরক্ত হলেও কি করবে, মামা তো।—সম্পর্কতো ফেলনা নয়।—ছোট ভটচাযের কোন জ্ঞান নাই। মাঝে মাঝে হৃদয়কেই শালা বলে গাল দিয়ে ওঠেন।—ডাকেন—হৃদে।

হৃদয়ও মাঝে মাঝে ধমক দেয়। কিন্তু মামাকে সমীহ করে, ভয় করে। কেউ কিছু বলতে এলে আচ্ছা কারে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেয়। হৃদয়ের মনেও মাঝে মাঝে ডাক দেয় হয়ত, মামা সাধারণ লোক নয়। অনেক বড়। কিন্তু কত বড় সে সম্বন্ধে জ্ঞান নাই। সে বড়র কল্পনা করাও সহজ নয়। আজ পর্যন্ত কেউ পেরেছে কিনা বলা যায় না।—হয়ত মুনি ঋষিরা কিছু বুঝে থাকবেন।—কতটা বুঝেছিলেন সে কথা তাঁরাই জানেন, সাধারণ মানুষ বুঝবে কি করে। তাই হৃদয়ও সবটা বোঝেনি কিন্তু কিছু বুঝেছে।

মথুরবাবু পূজারী খুঁজছেন। না হলে যে দেবীর পূজা বন্ধ হয়ে যায়।

মা নিজেই তাঁর পূজক টেনে আনলেন।

ঠাকুরের এক ভাই, খুড়োর ছেলে—রামতারক চট্টোপাধ্যায় এলেন দক্ষিণেশ্বরে। বেকার লোক, কাজের ধান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মথুরবাবু যেন নিশ্চিন্ত হলেন, বেশ হলো। ঠাকুরের লোক পাওয়া গেছে। প্রতিষ্ঠা করেছে রামকুমার, তারপর এলেন গদাধর, রামকুমারের ছোট ভাই। এবার হবেন রামতারক, ঠাকুরের খুড়তুতো ভাই। সঙ্গে থাকবে ভাগ্নে হৃদয়। এই ভাল, এই বেশ হলো—

রাণীও তাই বলেন—বেশ হলো, ছোট ভটচায ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত ইনিই থাকুন।

রামতারক বিষ্ণুভক্ত লোক। বিষ্ণুর উপরে অসীম ভক্তি।—কিন্তু জ্ঞানী লোক। আজ কেন কালী কদম্বেরি মূলে বনফুল-

হার ·লুকাল কোথায়'— শক্তির নানা বিকাশ। কালীপূজায় রামতারকের আপত্তি নাই। শক্তি মন্ত্রে দীক্ষা নেয়া আছে।

রামতারক পূজারি পদে বহাল হলেন। হৃদয় দেবীর বেশকারী। আর একটি কাজ হৃদয়ের আছে, মামার তদারক করা।

মথুরবাবু সাবধান করে দিয়েছেন—ছোট ভটচাযের ভালমন্দ কিছু হলে তিনি একজনকেও মন্দিরে রাখবেন না।

সবাই দৃষ্টি রাখে গদাধরের উপরে। গদাধরের দৃষ্টি নেই কার উপরে—একমাত্র জগদম্বা ছাড়া। তাঁর যা কিছু আলাপ, রাগ, অভিমান, পরামর্শ সব জগদম্বার সঙ্গে।

রামতারকও দেখেন।

মথুরবাবু খোঁজ খবর নেন। ছোট ভটচায কেমন আছেন, কি করেন।—নেবেন না? ছোট ভটচায যে দক্ষিণেশ্বরকে পীঠস্থান করেছেন!

রামতারক পূজা করেন।—আবার নিয়ম-রীত সব মেনে পূজা হচ্ছে। পূজার বিধি ব্যবস্থা থেকে একচুলও নড়েন না।—মন্দিরের কর্ম্মচারিরা খুশি—হাঁ, এবার মায়ের পূজো ঠিক হচ্ছে।—এ নাহলে পূজা। এতদিনতো ছেলেখেলা হয়েছে। রাণীমা বুঝতে চাননি—সেজবাবু বোঝেননি। কিন্তু বাবা, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে—কেমন, হয়েছে তো?—ছোট ভটচায একেবারে পাগল হয়ে গেছেন তো?—এ আর সারবার নয়, যত ডাক্তার বদ্যিই বেটে খাওয়ান হোক না!

হৃদয়ও খুশি!—যাক্ বাবা, দেবীকে নিয়ে খেলা তো বন্ধ হলো—তারক মামা ভাল পূজা করেন!

রামতারক এসেছেন প্রায় একমাস। শক্তি পূজো করেন, মাঝে মাঝে উন্মনা হয়ে যান।

খবর এলো রামতারকের ছেলে মারা গেছে।

রামতারক দেবী পূজা ছেড়ে দিলেন। কেন ছাড়লেন তিনিই জানেন। বোধহয় ভেবেছেন, না হলে হয়ত ছেলেটা মারা যেত না।

ঠিক হলো—রামতারক করবেন রাধাগোবিন্দজীর পূজা এবার থেকে, হৃদয় হবে মায়ের পূজারি।

ব্যবস্থাটা হৃদয়ের মনের মত।

রাণী ও মথুরবাবু ঠাকুরের অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন। যত দিন যেতে লাগল ততই আরো বেশী করে ঠাকুরের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়তে লাগলেন। ঠাকুর জানবাজারে এলে মথুরবাবু যে ঘরে শুতেন সে ঘরেও মাঝে মাঝে রাত কাটাতেন। রাণীর যদি ঠাকুরের উপরে এত আকর্ষণ না থাকত তবে ঠাকুরের হয়ত অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হতো।

রাণীর ভয়ে ইচ্ছা থাকালেও কেউ গদাধরের উপরে অত্যাচার করার সাহস পেত না।

মথুরবাবু ঠাকুরের জন্য মিছরির সরবতের ব্যবস্থা করে দিলেন। ব্যবস্থা করে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না—ব্যবস্থামত কাজ চলার দিকে নজর দিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বড় নাম। অতবড় কবিরাজ তখন সারা ভারতে ছিল না। মথুরবাবু ঠাকুরকে চিকিৎসা করাবেন। গঙ্গাপ্রসাদ সেন মশাই চিকিৎসা আরম্ভ করলেন।

চিকিৎসা! চিকিৎসায় কি হবে? ওষুধে কি উন্মাদ রোগ ভাল হয়! এ দিব্য উন্মাদ রোগ সাধকের জীবনে প্রথম দিকে দেখা দেয়! তারপর আপনি সেরে যায়।

গঙ্গাপ্রসাদ বাবু মন দিয়ে চিকিৎসা করেন। জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে চিকিৎসা করেন। কবিরাজি শাস্ত্রের সব কিছুই প্রয়োগ করেন। কিন্তু গদাধর যে রকম সে রকমই থাকেন।

রাণী ভাবেন, ছোট ভটচায কি ভাল হবেন না? মন বলে হবে—রাণীর হুকুম, যত খরচ হয় হোক—ছোট ভটচাযের যেন চিকিৎসা বন্ধ না থাকে। মথুরবাবুর যত্ন আর রাণীর নিষ্ঠা গদাধরের জন্য অশেষ।

অন্য কর্ম্মচারিরা ঈর্ষা করে।

একদিন ঠাকুর গেছেন গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে। তাঁকে যেতে হয়, সে দিনও গেছেন। পূর্ব্ববঙ্গ থেকে এবার এক কবিরাজ এসেছেন—তিনি আছেন গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে।

ঠাকুর এলেন।

পূর্ব্ববঙ্গের কবিরাজটি শুধু আয়ুর্ব্বেদেরই খোঁজ রাখতেন না—সাধন ভজনও জানতেন।

ঠাকুরকে দেখে তিনি চমকে উঠলেন। অবাক! কে বলে এ উন্মাদ? যারা একে উন্মাদ বলে তারাই উন্মাদ—সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ ঘোরতর সাংসারিক উন্মাদ।

বৈদ্য গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে বললেন,—এ রোগ ওষুধে সারে না। এ রোগের ওষুধ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নাই। এ আমাদের শাস্ত্রের বাইরে। রোগ সময় হলে আপনি সেরে যাবে। রোগমুক্তির পর এঁরা জগতকে পথ দেখিয়ে দেন।

গঙ্গাপ্রসাদ সেন শোনেন, কথা শুনে তিনি কি ভাবলেন তিনিই জানেন। চিকিৎসা বন্ধ করলেন না।

গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসা চলে, ঠাকুরও তেমনি থাকেন।

চন্দ্রমণির দু'চোখের জলের ধারা থামে না। তাঁর বড় আদরের গদাধরের একি হলো?—কেন তিনি ছেলেকে কোল ছাড়া, কাছ ছাড়া করেছিলেন।—হৃদের মুখে শুনেছেন, পঞ্চবটির জঙ্গলে যেয়ে ঘোর সন্ধ্যায়, গভীর রাতে গদাই চোখ বুজে বসে থাকত। তখনই এ সর্ব্বনাশটি হয়েছে। চারদিকে মুসলমানদের কবর—সেখানে একা একা ভোরে, দুপুরে, সন্ধ্যার ঘোরে, গভীর রাতে কেউ যায়?

চন্দ্রমণি ওঝা দেখালেন।

ওঝা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে। ঝাড়ফুঁক চলে, বড় শক্ত ভূত কাঁধে চেপেছে; হয়ত কবর থেকে এসেছে তাই এরকম একগুঁয়ে।

তান্ত্রিক অভয় দেয়—ভয় নেই বেটি।—ও ভূতটুত কিছু নয়, গ্রহের কোপ। শান্তি স্বস্ত্যয়ন কর—ছেলে ভাল হয়ে যাবে।

তান্ত্রিক ফর্দ্দ শোনান, কোথায় কবে কার কুগ্রহের দোষ সারিয়েছেন—চন্দ্রমণি আশ্বস্থ হন।—যোগাড় যন্ত্র করেন।

ধূমধাম করে শান্তি স্বস্ত্যয়ন হয়। তান্ত্রিক তাবিজ-কবজ দিয়ে, ভরসা দিয়ে চলে যান।—গদাধর, যে গদাধর সে গদাধর। আশাভঙ্গে চন্দ্রমণি কাতর হয়ে পড়েন।

তিনটি হৃদয়ের কাতর উদ্বেগ রোজই ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়—আমার গদাধরকে ভাল কর, ছোট ভটচায ভাল হয়ে উঠুন, মায়ের সাধক পূজারি ভাল হয়ে উঠুন।

চন্দ্রমণি ভাবেন, রাণী রাসমণি ভাবেন, আর ভাবেন মথুরবাবু। রাণীর জামাই, রাণীর ডান হাত।—ইংরাজি নবীশ কিন্তু নাস্তিক নয়। কাতর উদ্বেগে দিন কেটে যায়।

শান্তি স্বস্ত্যয়ন, ঝাড়ফুঁক, চিকিৎসা সব কিছুই হার মানল। কিন্তু একদিন গদাধর ভাল হলেন, গদাধর ঠাকুর রামকৃষ্ণ হলেন।

দক্ষিণেশ্বর তীর্থ হয়ে উঠল।—সারা পৃথিবী পরিচয় পেল দক্ষিণেশ্বরের—জানল রাসমণির নাম—দক্ষিণেশ্বর হলো সিদ্ধপীঠ।—গদাধর সিদ্ধিলাভ করে এখানেই ঠাকুর-রামকৃষ্ণ হলেন।—এখানেই নরেন বিবেকানন্দ হয়ে বিশ্বজয় করেন।—এ মন্দির বানিয়ে গদাধরকে সহায়তা করে রাণী রাসমণি আর মথুরবাবু অমর হলেন। জানবাজারের মাহিষ্য জমিদার বংশ ধন্য হলো।—গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবনের মত হলো দক্ষিণেশ্বর—তীর্থস্থান।

শাক্ত বৈষ্ণব নানামতের সুযোগ নিয়ে ইংরাজ তখন দেশের ধর্ম্ম জীবনেও বিভেদ সৃষ্টি করছে। ইংরাজের মূল মন্ত্রই হল 'ডিভাইড এণ্ড রুল'।—দেশের লোক উচ্ছৃঙ্খলতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে।—লোকে বিশ্বাস হারিয়ে নাস্তিক হয়ে উঠেছে। এই অধঃপতনকে রুখবার জন্য দাঁড়ালেন রামমোহন রায়, দাঁড়ালেন কেশব সেন। দেশী ও বিদেশী ধর্ম্মের মধ্যে আপোষের চেষ্টা করেন।

সাকার পূজা সরিয়ে দাও, নিরাকার চৈতন্যের পূজা কর।—শিক্ষিত

সম্প্রদায়ের একদল তখন দেশে এ মতবাদ প্রচারে উঠে পড়ে লেগেছেন। লোকেও সেদিকে ঝুঁকেছে।—মূর্ত্তিপূজা আর হিন্দুর দেব দেবীর তখন বিরূপ সমালোচনা।

এর উপরে ছিল একদল নাস্তিক। এই জগাই মাধাইয়ের দলটি বড় কম ছিল না। লেখাপড়া শিখে শিক্ষিতেরা এই দলে নাম লেখাত। লোকে তখন এরকম দিশেহারা। আমাদের সব কিছুই নিকৃষ্ট, আমরা নিজেরাও নিকৃষ্ট, এই যখন দেশের ধারণা তখন এলেন রামকৃষ্ণ। অবিশ্বাসীর বিষ দাঁত ভেঙ্গে দিলেন, ইংরাজের দেশ জয় করলেন। দেশী বিদেশী আপোষকামী ধর্ম্মকে চুরমার করে দিলেন।

অবিশ্বাসী নরেন স্বামী বিবেকানন্দ হলেন। পাশ্চাত্য জগতের লোক চমকে উঠল। তারা এতদিন মিশনারীদের কাছে শুনেছে অজ্ঞান ভারতের ধর্ম্ম,জীবনের অন্ধকার দূর করবার জন্য মিশনারীদের কত আগ্রহ। তারা এবার বিপুল আগ্রহে স্তব্ধ বিস্ময়ে ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞান ধর্ম্মের কথা শুনল। আর শুনল ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা, দক্ষিণেশ্বরের কথা।

ভগ্নী নিবেদিতা এলেন ভারতের দুহিতা হয়ে।

সবই এই দক্ষিণেশ্বর—সবই রাণী রাসমণির পুণ্য কর্ম্মের ফল। গাছটি বড় হয়ে ফলে ফুলে ভরে উঠে ডাল পালা ছড়িয়ে ক্লান্ত পথিককে আশ্রয় দেয়। কিন্তু যে-যত্ন করে গাছটি লাগায়, সযত্নে বড় করে তোলে—তার মূল্যইতো গোড়ায়, মূলে।

রাণী রাসমণি এসেছিলেন ঠাকুরের একাজ করবার জন্য। করে গেছেন। তাই তিনি আমাদের কাছে অমর।

ঠাকুর শোনালেন, জলকে Water বল, পানি বল—যা-ই বলনা কেন পুকুরের চারিদিকে জল লওয়ার যত পদ্ধতি করনা কেন, যে যেখান দিয়ে আসুক, জলকে যা-ই বলুক—সে জল নিয়ে ও খেয়ে প্রাণ শীতল করতে পারে। কালীঘাটে কেউ যাচ্ছে হেঁটে, কেউ যাচ্ছে গাড়িতে, যার যেরকম করে খুশি যাক কিন্তু গেলে মূর্ত্তি সকলেই দেখতে পাবে।

এ এক অদ্ভুত কথা ! কেউ তো একথা বলেনি, বিভ্রান্ত লোকেরা সব ফিরে দাঁড়াল। যেন একথা গুলিই তারা খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

লোকে বিস্ময়ে সম্ভ্রমে ঠাকুরের পায়ে শরণ নিল, ছুটে এলো দক্ষিণেশ্বরে। তৃপ্ত হলো অমৃতের স্বাদ পেয়ে, ঠাকুরকে দর্শন করে, মন্দিরে মাকে দর্শন করে।

সার্থক হলো রাণী রাসমণির দান, সার্থক হলো মথুরামোহনের চেষ্টা ও যত্ন—ধন্য হল ভারতবর্ষ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে। আজ রাণী এসেছেন ঠাকুরবাড়িতে। কর্মচারীরা বড় ব্যস্ত, রাণীকে কর্মপটুতা দেখাতে হবে।

রাণী মাঝে মাঝে মন্দিরে আসেন। সে দিন কর্মচারিদের হাঁক ডাক কত ! বাইরের লোক সেদিন বোঝে আজ রাণী এসেছেন।

রাণী এসেছেন। এলেই ছোট ভটচাযের কাছে গান শোনেন। গান তো নয় সুধা-ধারা।—রাণী গান শুনতে শুনতে অন্য জগতে চলে যেতেন। সংসার জগৎ ভুলে যেতেন।

রাণী গঙ্গা স্নান করে পবিত্র হয়ে এলেন। মাকে দর্শন করতে মন্দিরে যাবেন। তার আগে পবিত্র হয়ে নিতে হবে, বিষয় কর্ম্মের কালিমা সব গঙ্গা জলে বিসর্জন দিতে হবে। তারপর তো মন্দিরে দেব দর্শন।

মায়ের বেশপূজা হয়ে গেছে।—রাসমণি এসে প্রণাম করে মার মূর্ত্তির সামনে আহ্নিকে বসলেন।

ছোট ভটচায সামনে বসে মার নাম গান করছেন। গেয়ে চলেছেন যেন গঙ্গার স্রোত—কুলকুল করে বয়েই চলেছে। গদাধর ভাবে বিভোর, যেন জ্ঞান নাই। এ প্রাণের ডাকে পাষাণ গলে যায়। রাণী রাসমণির তো দয়ার প্রাণ।

হঠাৎ গান বন্ধ হয়ে গেল। যেন চট করে সুরে বাজতে বাজতে সেতারের তারটি ছিঁড়ে গেল।

ঠাকুর ধমকে উঠলেন, এখানেও ঐ ভাবনা, ঐ চিন্তা।

কাকে বলছেন? পাগল ঠাকুর সবাকেই চমকে দিলেন। কর্ম্মচারিরা কাউকে খুঁজে পায় না। সামনে তো রাণীমা বসে। রাণীমাকেই ধমকাচ্ছে নাকি পাগলা? ঠাকুর শুধু ধমক দিয়েই চুপ করলেন না, রাসমণির পিঠে চড় মেরে বসলেন। ঠিক যেমন করে গুরু শাসন করে অবাধ্য শিষ্যকে। কর্মচারীরা হৈ হৈ করে উঠল। সর্বনাশ, পাগলা কার গায় হাত দিয়েছে! বলিনি কতবার? রাণীমা ও জামাইবাবুকে বলেছি, উন্মাদ পাগলকে সরিয়ে দিন। কোন দিন কি করে বসে ঠিক কি! কেমন, এখন হলতো! কিন্তু এর একটা বিহিত করা দরকার। আমাদের সামনে পাগলা রাণীমার গায়ে হাত তুলেছে, আমাদের তো লাঠি পেটা করবে। পাগলাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে।

কর্মচারীরা দৌড়ে এলো।

কেউ কেউ গেল জামাইবাবু মথুরামোহনের কাছে। তাঁর হুকুম ছোট ভটচায যাই করুক, তোমরা কিছু বলবেনা—শুধু আমাকে জানাবে। তাই জানাতে গেছে। এতবড় একটা ঘটনা কি না জানিয়ে থাকতে পারে? বড়লোকের মেজাজ খুশি হতেও সময় নাই বিগড়াতেও দেরি নাই। এবার পাগলা ঠাকুর গেল।

রাণীর দাসি, চাকর, কর্মচারি, দারোয়ান, যে যেখানে ছিল হৈ হৈ করে ছুটে এলো। হৃদয় আর রামতারক অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে।

বিকার নাই শুধু দু'জনের—ঠাকুর আর রাণী রাসমণির।

ঠাকুরের মুখে মৃদু প্রশান্ত হাসি।—রাণী মাথা নিচু করে আছেন। অন্তর পুড়ে যাচ্ছে অনুতাপে।

জগজ্জননীর সামনে বসে একি চিন্তা এলো মনে!—ছোট ভটচায অন্তর্যামী—সব জেনে তাঁকে শাসন করেছেন।—বড় স্নেহ করেন। বিপথ থেকে টেনে নিয়ে এলেন। এইত গুরুর কাজ।

রাণী হাত তুলে সকলকে সরে যেতে বললেন।

—চুপ করে সব বাইরে চলে যাও।

সংবাদ পেয়ে মথুরবাবু ছুটে এলেন। কথাটা তাঁর কানে বেশ করে রং চড়িয়ে পাঠান হয়েছে। বোধহয় রাণীকে গিয়ে আর জীবন্ত দেখেন কিনা সন্দেহ। জীবন্ত পেলেও এখন কতদিন ডাক্তার-বাড়ি দৌড়াতে হবে কে জানে!

রাণী রাসমণি তো আর সাধারণ মেয়ে নয়।—সাধন পথে অনেক এগিয়ে গেছেন অষ্টশক্তির একশক্তি।

বললেন, দোষ আমার। ভটচায মশায়কে কেউ কিছু বললে আমি তাকে শাস্তি দেব।—মায়ের সামনে পূজোয় বসেও আমার মন বিষয় চিন্তায় ঘুরছিল। ভটচায অন্তর্যামী—মনের কথা টের পেয়ে আমাকে শাসন করেছেন। ভটচায আমার গুরু। তাঁকে কেউ কিছু বললে আমি শক্ত হাতে তার বিধান করব।

মথুরবাবুও সে হুকুম দিলেন।

কর্মচারী, দাসদাসী, দারোয়ান সকলে অবাক।—বলে কি! রাণীর গায়ে হাত দিলেও পাগলা ঠাকুরকে কিছু বলতে পারা যাবে না। কি জানি বাবা বড় লোকের খেয়াল। পাগলা ঠাকুর এর পরে আমাদের ধরে যদি লাঠি পেটা করে তবুও সইতে হবে? কিছু বলা যাবে না?—যাকগে বাবা, বড় লোকের বড় কথায় আমাদের কাজে কি।—আমরা গরীব গুরবো লোক—যা বলে তাই করব।—আমাদের কাজ হুকুম শোনা, তাই শুনে যাই।

অবাক হলো হৃদয়, অবাক হলো রামতারক। ঠাকুরের নিজের লোক হলে হবে কি—তারাও ঠাকুরকে চিনতে পারেনি।—চিনেছিলেন শুধু রাণী।

ঠাকুর বলতেন—রাসমণি হচ্ছেন মা কালীর অষ্ট সখির এক সখি—আট শক্তির এক শক্তি। সাধারণ মানুষ মনে করো না। এত তেজ, এত দয়া, এত বুদ্ধি, এত রূপ কি মানুষের হয়?

রাসমণির যত ভক্তি ছিল ঠাকুরের উপরে, ঠাকুরের তত স্নেহ ছিল রাসমণির উপরে।

রাণী ঠাকুরকে চিনেছিলেন। তাই পাখি যেমন অশক্ত শাবককে ডানায় আড়াল করে রাখে—গদাধর রামকৃষ্ণ হবার আগে রাসমণিও তেমনি আড়াল করে রাখতেন ছোট ভটচাযকে। ঠাকুরের হাতে চাটি খেয়ে রাণীর অন্তর অনুতাপে পুড়ে যাচ্ছিল।—মন শক্ত করলেন। এবার বিষয় থেকে মনটাকে একটু ঢিলে দিতে হবে।—ঠাকুর প্রশান্ত মুখে বসে আছেন, মুখে মৃদু হাসি। যেন মেয়ের কাণ্ড দেখে বাপের মুখে স্নেহের হাসি।

মথুরবাবু ইংরাজি নবীশ শিক্ষিত লোক। প্রথমে তিনিও অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ঠাকুরের কাছে এসে দাঁড়াতেই, রাগ অসন্তোষ সব দূরে গেল।

রাণী বলেছেন, ছোট ঠাকুর অন্তর্যামী। মথুরবাবুর তাই মনে হলো—ছোট ভটচায অন্তর্যামী।

কর্ম্মচারিদের রাগ পড়ল হৃদয় আর তারকের উপরে। রাণীমার গায়ে হাত তুলেও ছোট ভটচাযের কোন শাস্তি হলো না।—এ যেন তাদের হার! ভটচাযকে কিছু বলা যাবে না—কিন্তু ভটচাযের নিজের লোকদের সঙ্গে লাগতে তো জামাইবাবু নিষেধ করেননি।—

রামতারক নিরীহ লোক চুপ করে থাকে।

হৃদয় চুপ করে থাকার পাত্র নয়। ঢিলটি ছুঁড়লে উল্টে পাটকেলটি ছুঁড়ে মারতে জানে।

—ওঃ-। অন্তর্যামী!—বলুন তো আমি কি ভাবছি।

হৃদয়কে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে।

—মামাকে লাগবে না—তোমাদের কথা আমি-ই পারি।—হৃদয় বলে, তোমাদের মধ্যে বালতি নামিয়ে ময়লা সাফ করতে হবে।

নিজে যা খুসি বলুক কিন্তু অন্য কেউ কিছু মামাকে বললে হৃদয়ের সহ্য হয় না। রামতারক হৃদয়কে ডাকেন।—আহা থাক থাক।

হৃদয় বলে, দেখছ না ওদের জ্বলুনি! বড় আশায় ওদের ছাই পড়েছে।

সংবাদ পেয়ে মথুরবাবু ছুটে এলেন। কথাটা তাঁর কানে বেশ করে রং চড়িয়ে পাঠান হয়েছে। বোধহয় রাণীকে গিয়ে আর জীবন্ত দেখেন কিনা সন্দেহ। জীবন্ত পেলেও এখন কতদিন ডাক্তার-বাড়ি দৌড়াতে হবে কে জানে!

রাণী রাসমণি তো আর সাধারণ মেয়ে নয়।—সাধন পথে অনেক এগিয়ে গেছেন.অষ্টশক্তির একশক্তি।

বললেন, দোষ আমার। ভটচায মশায়কে কেউ কিছু বললে আমি তাকে শাস্তি দেব।—মায়ের সামনে পূজোয় বসেও আমার মন বিষয় চিন্তায় ঘুরছিল। ভটচায অন্তর্যামী—মনের কথা টের পেয়ে আমাকে শাসন করেছেন। ভটচায আমার গুরু। তাঁকে কেউ কিছু বললে আমি শক্ত হাতে তার বিধান করব।

মথুরবাবুও সে হুকুম দিলেন।

কর্মচারী, দাসদাসী, দারোয়ান সকলে অবাক।—বলে কি! রাণীর গায়ে হাত দিলেও পাগলা ঠাকুরকে কিছু বলতে পারা যাবে না। কি জানি বাবা বড় লোকের খেয়াল। পাগলা ঠাকুর এর পরে আমাদের ধরে যদি লাঠি পেটা করে তবুও সইতে হবে? কিছু বলা যাবে না?—যাকগে বাবা, বড় লোকের বড় কথায় আমাদের কাজে কি।—আমরা গরীব গুরবো লোক—যা বলে তাই করব।—আমাদের কাজ হুকুম শোনা, তাই শুনে যাই।

অবাক হলো হৃদয়, অবাক হলো রামতারক। ঠাকুরের নিজের লোক হলে হবে কি—তারাও ঠাকুরকে চিনতে পারেনি।—চিনেছিলেন শুধু রাণী।

ঠাকুর বলতেন—রাসমণি হচ্ছেন মা কালীর অষ্ট সখির এক সখি—আট শক্তির এক শক্তি। সাধারণ মানুষ মনে করো না। এত তেজ, এত দয়া, এত বুদ্ধি, এত রূপ কি মানুষের হয়?

রাসমণির যত ভক্তি ছিল ঠাকুরের উপরে, ঠাকুরের তত স্নেহ ছিল রাসমণির উপরে।

রাণী ঠাকুরকে চিনেছিলেন। তাই পাখি যেমন অশক্ত শাবককে ডানায় আড়াল করে রাখে—গদাধর রামকৃষ্ণ হবার আগে রাসমণিও তেমনি আড়াল করে রাখতেন ছোট ভটচাযকে। ঠাকুরের হাতে চাটি খেয়ে রাণীর অন্তর অনুতাপে পুড়ে যাচ্ছিল।—মন শক্ত করলেন। এবার বিষয় থেকে মনটাকে একটু ঢিলে দিতে হবে।—ঠাকুর প্রশান্ত মুখে বসে আছেন, মুখে মৃদু হাসি। যেন মেয়ের কাণ্ড দেখে বাপের মুখে স্নেহের হাসি।

মথুরবাবু ইংরাজি নবীশ শিক্ষিত লোক। প্রথমে তিনিও অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ঠাকুরের কাছে এসে দাঁড়াতেই, রাগ অসন্তোষ সব দূরে গেল।

রাণী বলেছেন, ছোট ঠাকুর অন্তর্যামী। মথুরবাবুর তাই মনে হলো—ছোট ভটচায অন্তর্যামী।

কর্ম্মচারিদের রাগ পড়ল হৃদয় আর তারকের উপরে। রাণীমার গায়ে হাত তুলেও ছোট ভটচাযের কোন শাস্তি হলো না।—এ যেন তাদের হার ! ভটচাযকে কিছু বলা যাবে না—কিন্তু ভটচাযের নিজের লোকদের সঙ্গে লাগতে তো জামাইবাবু নিষেধ করেননি।—

রামতারক নিরীহ লোক চুপ করে থাকে।

হৃদয় চুপ করে থাকার পাত্র নয়। ঢিলটি ছুঁড়লে উল্টে পাটকেলটি ছুঁড়ে মারতে জানে।

—ওঃ। অন্তর্যামী !—বলুন তো আমি কি ভাবছি।

হৃদয়কে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে।

—মামাকে লাগবে না—তোমাদের কথা আমি-ই পারি।—হৃদয় বলে, তোমাদের মধ্যে বালতি নামিয়ে ময়লা সাফ করতে হবে।

নিজে যা খুসি বলুক কিন্তু অন্য কেউ কিছু মামাকে বললে হৃদয়ের সহ্য হয় না। রামতারক হৃদয়কে ডাকেন।—আহা থাক থাক।

হৃদয় বলে, দেখছ না ওদের জ্বলুনি ! বড় আশায় ওদের ছাই পড়েছে।

সেজবাবু এলে এবার আমি বলব। ওরা যা বলে তা তো বলবই, আরো বানিয়ে বলব।

সাপের মাথায় যেন ধূলে পড়া পড়ল। সর্ব্বনাশ, এ সব কথা জামাইবাবুর কানে গেলেই রাণীমার কানে যাবে। হৃদয়ের অসাধ্য কিছু নাই। মন্দিরের পূজারি সত্য মিথ্যা করে পাঁচখানা লাগালেই হয়েছে।—রাণীমা তাড়িয়ে দেবেন।

—হৃদয় দাদা, এসব কথা জামাইবাবুকে বলতে যেয়ো না, কর্ম্মচারিরা বলে, তুমি ঠাট্টাও বোঝ না!

হৃদয় বলে,—বুঝব না কেন, আমি কি কচি খোকা?

ঠাকুরের এসব কিছুই কানে যায় না।—এসব খেয়াল করেন না। নিজের ভাবেই থাকেন।

ঠাকুর রাণীর আশ্রয়ে নিজের সাধনপথে এগিয়ে চলেছেন।

তন্ত্র সাধন করলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁর সহায় হলেন—সিদ্ধিলাভ করলেন।

এক রামাইত সাধু এলেন দক্ষিণেশ্বরে।—ঠাকুর সাধু জটাধারীর কাছে নিলেন রামমন্ত্রে দীক্ষা।

তোতাপুরী এলেন দক্ষিণেশ্বরে। পরম জ্ঞানী মহাসাধু তোতাপুরী বৈদান্তিক। ঠাকুর সন্ন্যাসে দীক্ষা নিলেন।

এই তোতাপুরীই ঠাকুরকে বলেছিলেন।

—স্ত্রীকে দেশে রেখে খুব কাম জয়ের বড়াই করছ। থাকত তোমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে, তবে বুঝা যেত তুমি কেমন বাহাদুর।

সুফি গোবিন্দরাম এলেন ঠাকুরকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষা দিতে।

দক্ষিণেশ্বরে বসেই ঠাকুর দীক্ষা পেলেন—সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন।

এই দক্ষিণেশ্বরে বসেই এক হাতে টাকা এক হাতে মাটি নিয়ে বলেছেন টাকা মাটি, মাটি টাকা। তারপর মাটি আর টাকা একসঙ্গে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছেন।

রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর—রাণীর ছোট ভটচায—রাণীর প্রতিষ্ঠিত মন্দির আর বিগ্রহ—সবই অতুলনীয়। রাণী নিজেই সব দেখে গেলেন—দক্ষিণেশ্বর পীঠস্থান হলো—গদাধর তাঁরই আশ্রয়ে থেকে রামকৃষ্ণ হলেন—দেবী জাগ্রত হলেন।

এমন মহা সৌভাগ্য আর কারো হয়েছে বলে জানি না।

১২৬৮ সালের ফাল্গুন মাস, আট তারিখ। রাণী দক্ষিণেশ্বরের দানপত্রে স্বাক্ষর করলেন।

কিছুদিন আগে হঠাৎ রাণী আছাড় খেয়েছেন। প্রথমে অতটা খেয়াল করেননি। পড়ে গেলে আর কি হবে—একটু চোট লাগে। রাসমণি গ্রাহ্য করলেন না। জ্বর হলো।

তবুও বিশেষ নজর দিলেন না। জ্বর হবে সে আর বেশি কথা কি। মানব দেহ—অসুস্থ হবে, সুখ হবে—সব হবে। এর জন্য এত অস্থির কেন? রাণী গ্রাহ্য করলেন না।

জ্বর হয়, কমে আবার হয়, আবার কমে—রাণী ওষুধও খান না।

রাণীর পেটের দোষ হলো। একটু বেশী রকমই দাঁড়াল। ডাক্তার দেখে বলে গেল গ্রহণী রোগ।

চিকিৎসা আরম্ভ হলো। কিন্তু কোন উপশম নাই। রাণী দুর্ব্বল হয়ে পড়লেন। বয়স তো কম নয়। বুড়ো বয়সের রোগ ভোগায়। সহজে ছাড়ে না।

উত্থানশক্তি রহিত হলেন। মথুরবাবু চিন্তিত হলেন। রাণীও চিন্তিত হলেন। কাজগুলি শেষ করে যেতে হবে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাণী কাগজে স্বাক্ষর করেন।

ডাক্তার কবিরাজ আসেন—ওষুধ দিয়ে যান, অশ্বাস দিয়ে যান। কিন্তু তাঁদের আশ্বাসে রোগ কমে না। কবিরাজ আসেন কিন্তু কোন উপকার হয় না।

রাণী বুঝতে পেরেছেন তাঁর সময় ঘনিয়ে আসছে। তাই সবার আগে দক্ষিণেশ্বরের দানপত্রটি ঠিক করে দেন।

কিন্তু তাতেও শান্তি নাই, উইলের নিয়ম অনুসারে উত্তরাধিকারীর স্বাক্ষর না থাকলে দানপত্র সিদ্ধ হবে না। রাণীর বড় মেয়ে পদ্মমণি বেঁকে বসেছেন। স্বাক্ষর দেবেন না। মা কি সবই দানধ্যান করে আমাদের পথে বসিয়ে যাবেন!

অন্তিমশয্যায় শুয়েও রাসমণির শান্তি নাই।

কালীকার সেবিকা রাণী রাসমণি।—বললেন আমাকে কালীঘাটে নিয়ে চল। মায়ের পায়ের কাছেই আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়ুক।

একথা তিনি বলবেনই তো! মায়ের অষ্ট সেবিকার একজন যে। অন্তিমে রাণীর মনে এ বাসনা জাগবে বইকি।

দক্ষিণেশ্বর নয়—কালীঘাট—রাণীকে কালীঘাটের বাড়িতে আনা হলো।

রাণী কালীঘাটে এলেন। কতলোক আসে—রাণীর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের মুখে শঙ্কিত প্রশ্ন, চোখে আকুল জিজ্ঞাসা—রাণী মা কেমন আছেন?

শান্তি স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হলো।

বড় বড় পণ্ডিতেরা এলেন, তান্ত্রিক এলেন। হোম, যাগ, যজ্ঞ, পূজা হলো। রাণীর উন্নতি নাই।

কালীঘাটে লোকের মেলা—যেন কোন যোগ। রাণীমার কুশল সংবাদ চাই। কেউ বা হেঁটে আসে, কেউ বা গাড়িতে আসে, কেউ বা আসে পাল্কিতে। সবাইর মুখে একই প্রশ্ন, এক জিজ্ঞাসা।

স্নানার্থী স্নান করে যায়—যেতে আসতে রাণীর দরজায় থামে। যদি কোন কুশল সংবাদ কানে আসে।

মন্দিরে পূজো দিতে আসে, রাণীর দরজায় একটু দাঁড়ায়—কি—কি—কেমন অছেন রাণী মা?

ভাল না।

বিষণ্ণ মুখে মন্দিরের দিকে চলে যায় তারা। পূজোর সময় আকুল প্রার্থনা জানায় দেবীর চরণে—মা ইচ্ছাময়ি, রাণীমাকে ভাল করে দাও।

দারোয়ানেরা হাঁপিয়ে ওঠে।

বিদেশীরা প্রশ্ন করে।

—জান না? উত্তর পায়, আমাদের রাণীমার অসুখ। দিনে দিনে অবস্থা খারাপ হতে থাকে। মথুরবাবু মায়ের মত শ্বাশুড়ির মাথার কাছ থেকে ওঠেন না। আঘাতটা তাঁরই বেশী। সব কথাই একে একে মনের দরজায় ভিড় করে আসে।

মথুরবাবু এবাড়ির আজ সেজ জামাই। কিন্তু প্রথম এসেছিলেন সেজ জামাই হয়ে নয়।

স্ত্রী মারা গেল। মথুরবাবু চলে যেতে চাইলেন। কেন থাকবেন কার জন্য শ্বশুরবাড়ি থাকা? যার জন্য শ্বশুরবাড়ি সেই যখন চলে গেল, তখন আর শ্বশুরবাড়ির ঘরে বসে থাকা কেন?

রাণী ছাড়বেন না। রাণী লোক চিনতেন। ছেলে নাই, ভরসা করেন এই জামাইকে। চলে গেলে ডান হাতটি ভেঙ্গে যাবে।

মথুরবাবু শিক্ষিত ছেলে, রুচিবান, ন্যায়পরায়ণ—নির্ভিক, সত্যবাদী। বললেন—তা হয় না, মা। আমাকে ছুটি দিন। আমি যাই। রাণী একটু ভাবলেন।

বললেন—ছুটি তুমি পাবে না বাবা। তুমি আমার ছেলের জায়গায় বসেছ। আমার সেজ মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছে। আমি মেয়েকে অন্য কার হাতে দেব বল? তাকে আমি তোমার হাতে দেব।

মথুরবাবু আবার বাঁধা পড়লেন। এ বাঁধন খুলে আর যেতে পারেননি, যাবার কথা মনেও হয়নি।

সব বাঁধনের উপরে আছে শ্বাশুড়ির স্নেহের বাঁধন।

সেই শ্বাশুড়ি আজ অন্তিম শয্যায়। মথুরবাবুর মনে হল যেন সব হারাতে বসেছেন! পরামর্শের দরকার হলে কার কাছে যাবেন? কে মায়ের মত স্নেহ দিয়ে আড়াল করে রাখবে?

ফাল্গুন মাসের প্রথম আট দিন কোন রকমে কাটল। যেন

দুহাতে দিনগুলি ঠেলে নেয়া হচ্ছে। রাণীমা তো যাবেনই, যে কদিন ধরে রাখা যায় তাই যেন লাভ।

নবমদিন বুঝি আর কাটে না। কখন কি হয়। জামাইরা বিষণ্ণ মুখে মাথার কাছে বসে, মেয়েরা পায়ের কাছে বসে নীরবে চোখের জল ফেলছেন।

রাণী কিন্তু সজ্ঞানে আছেন। যেন কোন কষ্ট কোন যাতনা নাই। সমুখে শান্তির পারাবার দেখতে পেয়েছেন।

গুরু পুরোহিতের পায়ের ধুলো মাথায় নিলেন। মা-কালীর নির্ম্মাল্য মাথায় রাখলেন। যাদের আশীর্ব্বাদ করার তাদের আশীর্ব্বাদ করলেন, যাদের আদর করবার তাদের আদর করলেন, যাদের সান্ত্বনা দেবার তাদের সান্ত্বনা দিলেন।

বাইরে ভিড়। কিন্তু নীরব। বিষন্ন মুখে কেউ বা দরজায় দাঁড়িয়ে, কেউ বা দাঁড়িয়ে রাস্তায়।—অসংখ্য লোকের ভিড়। রাণীর অবস্থার কথা সহরে ছড়িয়ে পড়েছে। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে—নাঃ, আর কোন আশা নাই। আজ টিকবেন কিনা সন্দেহ। শেষ দেখা দেখবে তো কালীঘাট চল।

লোকের স্রোত আসছে যেন সাগরের ঢেউ। এক প্রবাহের পরে আর এক প্রবাহ, যেন সমাপ্তি নাই। কিন্তু নিরব। নাই কোন কোলাহল নাই কোন গুঞ্জন। স্তব্ধ বিষন্ন জনসমুদ্র।

সারাদিন কোন রকমে কেটে গেল। ঘড়িতে আটটা বাজল।

রাতের অন্ধকার ঘনতর হচ্ছে। সব আলো জ্বালিয়ে দিল। মৃত্যু যেন অন্ধকারের আড়াল দিয়ে চুপে চুপে না আসে। বাড়ির সব আলো জ্বলছে। সারা বাড়ির অন্ধকারকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়েছে। দিনের আলোর মত উজ্জ্বল ও দৃশ্যমান।

রাণী চোখ বুজে আছেন। উৎকণ্ঠা নিয়ে সবাই তাকিয়ে আছেন রাণীর মুখের দিকে। বুঝি পলক নড়ে না! কি জানি যদি সেই পলকে রাণী মহাপ্রয়াণ করেন।

বাড়ির বাইরে লোকের ভিড় কমেনি। আজ আর অন্য কাজ নাই সব কাজের বড় কাজ রাণীর শেষ মুহূর্ত্তটির জন্য নীরবে অপেক্ষা করা। ধীরে ধীরে রাণী চোখ খুলে তাকালেন।

সবাই ঝুঁকে পড়ল।

রাণী আবার চোখ বন্ধ করে নিলেন। আলো ভাল লাগছে না। বললেন, সরিয়ে নে, সরিয়ে নে ওসব রোশনাই, ভাল লাগছেনা, সরিয়ে দে, নিভিয়ে দে। এখন আমার মা আসবেন, ঐযে তার শ্রীঅঙ্গের আলোয় চারিদিক আলো হয়ে উঠেছে, তোদের আলো সরিয়ে দে।

সাধিকা মাতৃমূর্ত্তির দর্শন পেলেন সজ্ঞানে। প্রিয় সাধিকাকে মর্ত্তলীলা শেষে নিয়ে যেতে দেবী নিজে এসেছেন। সেই দিব্য মূর্ত্তি দিব্য কান্তির কাছে এই আলো! যেন স্নিগ্ধ শান্তির মাঝে মহাজ্বালা আসন করে নিয়ে যায়।

সাধিকা পূণ্যশ্লোকা মহাশক্তির সেবিকা মহাপ্রস্থান করছেন— বন্ধন মুক্ত তাঁর যাত্রা। কিন্তু তবুও মনে আছে একটু দুঃখ।

বুঝি মহাশক্তি এসেছেন।

রাণী বললেন, মা তুমি এসেছ? এসো মা, তোমার পায়ে এবার বিলীন হয়ে যাব। যেখান থেকে এসেছি সেখানেই যাব। কিন্তু মা—

রাণীর কণ্ঠে অভিযোগ, শঙ্কা।—কি হবে মা, পদ্মমণি তো স্বাক্ষর দিল না!

রাণীর শেষ কথা, শেষ আকুতি—কি হবে মা, পদ্মমণি তো স্বাক্ষর দিল না।—

রাণী স্থির হলেন। মহাপ্রস্থানের পথে পা বাড়ালেন।

বাঙ্গালার আকাশ থেকে আলোকপুঞ্জ খসে পড়ল।

শোকে মুহ্যমান জনতা, শোকস্তব্ধ রাণী যাদের রেখে গেলেন তারা। ঠাকুর বসে আছেন। দক্ষিণেশ্বরে নেমে এসেছে রাত্রি। ডুবে আছে দক্ষিণেশ্বর।

ঠাকুর মুখ তুলে তাকালেন। —কে ?

—আমি বাবা। রাণী রাসমণি ঠাকুরের কাছে দাঁড়িয়ে।

শিব শিব বলে ঠাকুর যুক্তকর নিজের কপালে স্পর্শ করলেন। ঐ এক মুহূর্ত্ত।

ঠাকুর বুঝলেন তাঁর ভক্ত মায়ের কর্মশেষে মহাপ্রয়াণ করেছেন।

পরের দিন মথুর এলেন ঠাকুরের কাছে।

ঠাকুর বললেন, আমি জানি।

জানবেনই তো, ঠাকুর যে অন্তর্যামী। মথুরবাবু বিস্মিত হলেন না।

ঠাকুর গেয়ে উঠলেন—'ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয় মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে—ভুলোনা দক্ষিণা কালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে'। রাণী রাসমণির প্রিয় গান।

রাণীর শেষ যাত্রা—আদি গঙ্গার পুণ্যতীরে নিয়ে যাওয়া হবে। কতটুকুই বা পথ—যাকে বলে এক পা। কিন্তু এ পথটুকু কি পার হওয়া সোজা ? কেউ সরে যেতে চায় না—সবাই বলে আমি একবার দেখব—মা চলেছেন আমাদের ছেড়ে দেখব বই কি।

গলায় কত জোর! কত দাবি! যেন নিজের জন, শেষ দেখা দেখব না তো কি!

ধীরে ধীরে বাহকেরা চলেছেন।

পালঙ্কে শুয়ে আছেন মহারাণী—ফুলে ঢেকে আছে সারা দেহ—শুধু শ্বেত চন্দন লিপ্ত মুখটি জেগে আছে।

নাম কীর্ত্তন হচ্ছে—হচ্ছে মায়ের নাম। মুঠো মুঠো খই : আর টাকা পয়সা ছড়িয়ে পড়ছে। দানশীলা রাণী—সে রকম সমারোহ চাই বই কি।

আদি গঙ্গার কূলে জ্বলে উঠল পবিত্র অগ্নিশিখা—একটি সোনার দেহকে টেনে নিল শত বাহু মেলে। ধীরে ধীরে রাণীর নশ্বর দেহ সর্ব্বগ্রাসি হুতাশন গ্রাস করলেন।

অমর রাণীর নশ্বর দেহটি—আটষট্টি বছরের দেহটি নিঃশেষ হয়ে গেল। কিন্তু রাণী কি নিঃশেষে মুছে গেছেন? তুমি আমি যাই—এঁরা যান না।

একদেহ পরিত্যাগ করে এঁরা শত দেহে প্রবেশ করেন—বেঁচে থাকেন তোমার আমার মনে। আমরা চলে গেলে বেঁচে থাকবেন উত্তর পুরুষের মনে।

বড় তো অনেকেই হয়েছেন। অমর তো অনেকেই আছেন। পুণ্য কাজ তো অনেকেই করেছেন। কিন্তু বাংলার শান্তপল্লীর এক সাধারণ গরীব কৃষকের মেয়ে লোকের মনে রাণীর আসন পেতেছেন। কেন? কোথায় পেলেন এত তেজ, এত সাহস, এত মহত্ব? আকাশের মত উদার প্রাণ! গৃহস্থালীতে লক্ষ্মীরূপা, সেবায় অন্নপূর্ণা, আশ্রিতের জননী, প্রজার কাছে করুণাময়ী, আবার তেজে অসুরনাশিনী। কি করে সম্ভব হলো?

রাসমণি রাজবংশের মেয়ে বা বৌ না হয়েও ছিলেন সকলের রাণীমা।

জানবাজারের মাহিষ্য জমিদার বংশের সম্পত্তির তালিকা—

জানবাজার ষ্ট্রীট	১৮ নং দোকান	/১॥৶০
„ „	৩৭ নং বস্তি	৯৮০।৶০
„ „	৪৬ নং বস্তি	
„ „	৬৪ নং জমি	।২।০
„ „	৯৯ নং কুঠি	১/২।/০
„ „	১১১ নং বস্তি	।৩ ৶০
„ „	১১৫ নং কুঠী ও জমি	/৩ ৶০
„ „	১২৫ নং জমি	॥০।০
„ „	১৩০ নং জমি	/২।৶০

ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট	৩ নং জমি	
" "	৪ নং দোকান	/০৷৷/
" "	৫১ নং দোতলাকুঠী	১/২৸০
" "	৭১ নং কুঠী	৬৷০
রাসেল ষ্ট্রীট	১২ নং দোতলা কুঠী	৯/১৸৶০
" "	৭৪ নং " কুঠী	১৸০৶/০
" "	৭৫ নং " "	১৷৪৷৷৶০
" "	৭৫১ নং কুঠী আস্তাবল	/২৸৶০
" "	৭৬ নং দোতলা কুঠী	১৷৷০৸/০
" "	৭৭ নং জমি	১৷৷৪৸/০
মার্কেট ষ্ট্রীট	১৬ নং জমি	৷৷৪৸০
" "	১৭ নং জমি	৷৷০ /০
" "	৩৮ নং	
" "	৩৯ নং } জমি	৷৷০৷৷৶/০
" "	৪০ নং	
পোলক ষ্ট্রীট	২ নং দোতলা কুঠী	৸২৸৶/০
চৌরঙ্গী	২৪ নং দোতলা কুঠী	২ ০৶০
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট	১ নং দোতলা কুঠী	১৷৸৶/০
কীড ষ্ট্রীট	২ নং তেতলা কুঠী	৫৷৷৪৷৷৶০
মটার লেন	১৫ নং জমি	৷২৷০
" "	৪৫ নং কুঠী	১৷২
ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট	৮ নং জমি	৩৸৩৷৷৶/০
" "	২৫নং জমি ও দোকান	১৸২
" "	২৬নং জমি	২৷৷০ ৷৷০
গোয়ালাটুলী	৪নং জমি	/৪৶/০
" "	৫নং বস্তি	/৩৷৷৶/০
বেলেঘাটা	বাজার, বাগান, কুঠী, পুকুর	২৫/৩

ভবানীপুর	জগুবাবুর বাজার	৩/০
কালীঘাট	বাগান, কুঠী, পুকুর, গঙ্গার ঘাট	২/০
মার্কুইল ষ্ট্রীট	১২নং বস্তি	১/০ ।৶০
তালতলা	৮৭নং বস্তি	।৪
" "	৯নং বস্তি	/২॥০
ডাক্তার লেন	৬৪নং দোতলা কুঠী	২/৪
কোবার্থ লেন	৩নং জমি	।২॥/০
উমাচরণ দাসের লেন	৪নং জমি	।৩।০
" "	৭নং	৸০।৵০
মনোহরদাস ষ্ট্রীট	৪৭নং কুঠী	/০।৵০
মির্জাপুর লেন	১০নং গুদাম	॥১।৵০
রামহরি মিস্ত্রী লেন	জমি	/১।৵০
নীলমণি হালদার লেন	৩৬নং "	॥৪
পুরাতন চীনাবাজার	২০১—২০৫ দোতলা	১/২৸৶০
মুন্সি সদবদ্দি লেন	১নং জমি	/৪৸৵০
দত্ত লেন	৯নং বস্তি	।০ /০
মিশ্রি খানসামা লেন	১৬নং জমি	।৪৶০
শাঁখারীটোলা লেন	১২নং জমি	/২৵০
শরিফ দপ্তরি লেন	১নং বস্তি	।০ ৸০
বেড়ো বরঁদার লেন	১২নং বস্তি	।৩।০
সিঁথি	বাগান ও পুকুর	৩/৪

এ ছাড়া ঘিপুকুর, জগন্নাথপুর, মকিমপুর, কলরা, হোসেনপুর প্রভৃতি আরো কতগুলি আয়ের সম্পত্তি মফঃস্বলে ছিল।

রাণী রাসমণির প্রিয়গান—যে গানগুলি গদাধরের মুখে বার বার শুনেও তৃপ্তি পেতেন না।

ডুব ডুব্ ডুব্ সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম রত্নধন॥
খোঁজ খোঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আমার সে কোন জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

(কুবীর)

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
মাকে তুমি দেখো আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে॥
কাম আদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি,
রসনারে সংগে রাখি, সে যেন মা বলে ডাকে।
কুরুচি কুমন্ত্রী যত নিকট হতে দিওনা কো,
জ্ঞান নয়নে প্রহরী রেখো, সে যেন সাবধানে থাকে।
কমলা কান্তের মন ভাই আমার এই নিবেদন।
দরিদ্র পাইলে ধন সে কি অযতনে রাখে॥

(কমলাকান্ত)

"ওঠগো করুণাময়ী, খোল গো কুটির দ্বার
আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার।
সন্তানে রাখি বাহিরে, আছ সুখে অন্তঃপুরে
আমি ডাকিতেছি মা-মা বলে, নিদ্রা কি ভাঙ্গে না তোমার ?"

ডাক দেখি মন ডাকার মত
কেমন শ্যামা থাকতে পারে।
কেমন্ শ্যামা থাক্‌তে পারে
কেমন কালী থাকতে পারে।
মন যদি একান্ত হও
জবা বিল্বদল লও।
ভক্তি-চন্দন মিশাইয়ে
(মার) পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও॥

আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারু ঘরে
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন ঐ পরশমণি, যা চাবি তা দিতে পারে
কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ দুয়ারে।

ওগো আনন্দময়ী হয়ে মা, নিরানন্দ করোনা।
ওমা দু'টি চরণ বিনে আমার মন, অন্য কিছু আর জানে না।
তপন তনয় আমার নন্দ কর, কি বলিব তার বল না।
ভবানী বলিয়ে ভবে যাব চলে মনে ছিল এই বাসনা।
অকূল পাথারে ডুবাবি আমারে (ওমা) স্বপনেও তাতো জানি না।
অহর্নিশি দুর্গা নামে ভাসি তবু দুঃখ রাশি গেল না।
এবার যদি মরি, ও হরসুন্দরী, তোর দুর্গানাম আর কেউ লবেনা।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরু মূলে (রে মন) ফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া (তার) নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
(ওরে) বিবেক নামে তার বেটা, তত্ত্ব কথা তায় শুধাবি॥

শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি
(যখন) দুই সতীনে পীরিত হবে তখন শ্যামা মাকে পাবি
যদি না মানে নিষেধ তবে জ্ঞান খড়্গো বলি দিবি।
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য খোঁটা ধরে রবি।
ধর্মাধর্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে জ্ঞান খড়্গো বলি দিবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি ;
যদি না মানে প্রবোধ জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি।
প্রসাদ বলে এমন হলে কালের কাছে জবাব দিবি
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মতন মন হবি॥

পরিশিষ্ট

রাসমণির জন্ম	... ১২০০ সালের ১১ই আশ্বিন।
বিবাহ	... ১২১১ সালের ৮ই বৈশাখ
রাজচন্দ্রের প্রথম বিবাহ	... ১২০৮ সাল
প্রীতিরামবাবুর দেহত্যাগ	... ১৮১৭ (ইং) সাল
হরেকৃষ্ণের দেহত্যাগ	... ১২৩০ সাল
রাজচন্দ্রের মৃত্যু	... ১২৪৩ সাল
রাসমণির কোনা গাঁয়ে তিন রাত্রি বাস	... ১২৪৬ সাল
কাশীধামে যাবার উদ্যোগ	... ১২৫৫ সাল
দক্ষিণেশ্বরের জমি ক্রয়	... ১৮৪৭ (ইং) ৬ই সেপ্টেম্বর
মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা	... ১২৬২ সালের ১৮ই জৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার।
দক্ষিণেশ্বরের দানপত্রে সাক্ষর	... ১২৬৮ সালের ৮ই ফাল্গুন
দেহত্যাগ	... ১২৬৮ সালের ৯ই ফাল্গুন রাত্রি ৮টা
দেহত্যাগের সময়	... ৬৮ বৎসর বয়স।

রাসমণির জীবনের বিশেষ ঘটনা

রাজচন্দ্রের মৃত্যু ও সম্পত্তির ভার গ্রহণ।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাছ থেকে দুই লক্ষ টাকা উদ্ধার।

গঙ্গায় স্নানের ঘাট ও নিমতলা শশ্মান ঘাট নির্ম্মাণ।

রাজচন্দ্রের শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে দান তুলট ওজনের ৬০১৭ টাকা বিতরণ।

টোনায় খাল সংস্করণ।

জলকর নিয়ে সরকারের সঙ্গে বিবাদ ও জয়লাভ।

পূজার বাজনা নিয়ে সরকারের সঙ্গে বিবাদ ও জয়লাভ।

মাতাল গোরা সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিরোধ ও সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়।

গৃহরক্ষার কাজে বেতন দিয়ে গোরা সৈন্য নিয়োগ।

গরুটির জঙ্গলের কাছে গঙ্গার বুকে ডাকাতদের সঙ্গে সশস্ত্র লড়াই ও জয়লাভ।

কাশীধামে রওনা হওয়া, মত পরিবর্ত্তন ও ফিরে আসা

অন্নপূর্ণার প্রত্যাদেশ।

শিবশক্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প।

দক্ষিণেশ্বরের জমি ক্রয়।

রামকুমার ভটচাযের সঙ্গে আলাপ।

মন্দির প্রতিষ্ঠা।

দেবী প্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর ব্রত।

মূর্ত্তি স্থাপন।

গদাধরের দর্শন লাভ।

গদাধরকে মন্দিরের কাজে নিয়োগ।

স্নানযাত্রা উৎসবে বিঘ্ন।

মকিমপুর পরগণায় নীলকর ডোনাল্ড সাহেবকে শায়েস্তা করা।

নড়াইলের জমিদার রামরতনবাবুর অত্যাচার বন্ধ।

দক্ষিণেশ্বরের দানপত্রে স্বাক্ষর ও দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ের ব্যবস্থা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের তিরস্কারে বৈষয়িক বিষয় হতে মন সরিয়ে নেওয়া।

রাণী রাসমণির জীবন কাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সেই মহিয়সী মহিলার জীবন কাহিনীর বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। কিম্বদন্তীর সঙ্গে রাণী রাসমণির জীবন কাহিনী এমনভাবে মিশে আছে যে, সেজন্য বেশ কিছুদিন পরিশ্রম না করলে রাসমণির প্রামাণ্য জীবন আলেখ্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

ভাবতে অবাক লাগে পল্লীগ্রামের গরীব চাষীর মেয়ে রাসমণির অকুতোভয়তাকে। এত তেজ, এত দর্প কি করে সম্ভব হলো ?

যে কোম্পানির নামে তখন বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়, —দিল্লীর বাদশাহ পর্য্যন্ত যাদের অনুগ্রহপ্রার্থী, দুরন্তবর্গীরা সাবধানে যার সীমানা বাঁচিয়ে চলে, সেই কূট কৌশলি ইংরাজ কোম্পানিকে রাসমণি একবার নয় বারে বারে শিশুর মত নাস্তানাবুদ করেছেন। রাণীর সঙ্গে সংঘর্ষে ব্রিটিশ সিংহ প্রতিবারই লেজ গুটিয়ে রাণীর পদলেহন করেছে। যে নীলকর সাহেবেরা বাংলার বুকে বিভীষিকার রাজত্ব স্থাপন করেছিল, সে নীলকর সাহেবকে শায়েস্তা করেছেন। যে গোরা সৈন্যেরা পশুবলে অত্যাচার করে বেড়াত সে সশস্ত্র গোরা সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করতে অস্ত্র হাতে ছুটে গেছেন।

রাণীর জীবনে যেমন একদিকে এরকম তেজ, দর্প ও সাহস। অন্যদিকে আবার তেমনি—

প্রজার দুঃখে তার পাশে দাঁড়িয়েছেন। সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টে বিচলিত হয়ে পড়তেন। এজন্য চিন্তা করতেন। যে কেউ হোক রাণীর নিকটে সাহায্যের আবেদন করে বিমুখ হয়নি।

সাধারণ মানুষের দুঃখ রাণীর মনে এত আঘাত করত যে এজন্য নিজের কোন বিশেষ ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করলে যদি তাদের মঙ্গল হয়, রাণী সে কাজ করতে মুহূর্ত্ত মাত্র দ্বিধা করতেন না।

এতদিনের বিশ্বেশ্বর দর্শনের বাসনা রাণী এক মুহূর্ত্তে ত্যাগ করলেন, এত অর্থব্যয়ের কথা একবারও তাঁর মনে হয়নি।

পরিচিত অপরিচিত কতলোক যে রাণীর অন্নে পুষ্ট হয়ে জীবন ধারণ করেছে সে সংখ্যার হিসাব দেওয়া যায় না।

এ প্রসঙ্গে আর একজন মহিয়সী মহিলার নাম স্মরণে আসে।

রাণী ভবানী।

রাণী ভবানী ও রাণী রাসমণির জীবনে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে।

দুজনেই গরীবের মেয়ে। কিন্তু উত্তরকালে দু'জনই ছিলেন বিপুল

ধনের অধীশ্বরী। দু'জনেই মোহমুক্ত। দুজনের দানে ধন্য হয়েছিল দেশ। তেজ, দর্প, সাহস, কোমলতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে দুজনেই ছিলেন অতুলনীয়। রাসমণির জীবনে আরো একটি উজ্জ্বলতর দৃশ্য আছে। সে তাঁর ধর্ম্ম জীবন।

সে কথা মনে হলেই গীতার নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা মনে পড়ে, রাণীর জীবন ছিল এই নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুরূপ। তাই বুঝি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ রাণীর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরকে নিজের সাধন পীঠ বলে বেছে নিয়েছিলেন।

ধর্ম্ম জীবনে রাণীর আশ্চর্য্য দিব্য দৃষ্টি ছিল। গদাধরকে তিনি মায়ের মত আড়াল দিয়ে রাখতেন। লৌকিক অনাচারগুলি উপেক্ষা করে গদাধরকে কখন মায়ের পূজারীর পদ থেকে সরিয়ে দেননি। গদাধরের চপেটাঘাতকে হাসিমুখে হজম করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের তপ সিদ্ধিতে রাণীর দান অসামান্য।—ভাবতেও অবাক লাগে আধুনিক কালের মতে অশিক্ষিত অতীত জীবনে গরীব ও উত্তরকালে ঐশ্বর্যশালিনী হয়েও তিনি কি করে শিক্ষার প্রকৃতরূপ আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন।

রাণী কুটবুদ্ধিতেও ছিলেন অতুলনীয়।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরও বুদ্ধির যুদ্ধে রাণীর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেননি।

ইংরেজ কোম্পানিও বুদ্ধির যুদ্ধে রাণীর কাছে পর পর নাস্তানাবুদ হয়েছে।

ভারতবর্ষ কেন, সারা পৃথিবী খুঁজেও বোধ হয় এরকম অনবদ্য আর একটি চরিত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনেক মহিয়সী মহিলাই জন্মেছেন। অনেকেই অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গিয়েছেন। কিন্তু এরকম সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সন্ধান আর পাওয়া যায় না।

রাণী ছিলেন মা।

মায়ের মতই তাঁর অন্তরে দেখা দিত কখন বজ্রের কঠোরতা, কখন

কুসুমের মত কোমলতা। সন্তানের জন্য যখন যেটি প্রয়োজন সুমাতার মত তখনই সেটি প্রয়োগ করতেন।

রাণীর একটি গুণ ছিল। লোকচরিত্র সম্বন্ধে রাণীর জ্ঞান ছিল অদ্বিতীয়। দ্রুত চিন্তা করতে পারতেন, এত দ্রুত যে প্রতিপক্ষ প্রস্তুত হবার সময় পেত না।

রাণীর দৃঢ়তাও লৌহ কঠিন।

গরুটির কাছে যখন ডাকাতেরা তাঁর নৌকা আক্রমণ করে, রাণী নিজে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র সংঘর্ষ পরিচালনা করেছেন। প্রতিপক্ষ স্মরণ নিলে রাণির কঠিনতা কোমলতায় পর্যবসিত হলো।

ডাকাতেরা স্মরণ নিয়ে নিজেদের আকাঙ্খার কথা জানানমাত্রই রাণী প্রতিশ্রুতি দিলেন।

রাণীর চরিত্রের এ আর একটি দিক। জিঘাংসাহীন মনোবৃত্তি, কিন্তু প্রয়োজনে সংহারিণী। সাধারণ মানুষের মধ্যে এ গুণের বিকাশ সম্ভব নয়।

পতিভক্তিতেও রাণী অতুলনীয়।—রাজচন্দ্র পত্নীকে এত শ্রদ্ধা করতেন যে, তাঁর পরামর্শ না নিয়ে কোন কাজে তিনি অগ্রসর হন নি, কি জমিদারি পরিচালনা, কি ব্যবসা সব কাজেই রাণীর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি কাজে নামতেন।

ভাবতেও বিস্ময় বোধ হয়—রাণী এ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কোথায় পেলেন? সরল গ্রাম্য জীবনে এ শিক্ষা তিনি কোথায় পেলেন?

রাজচন্দ্রের প্রতি কাজেই যেমন রাণী তাঁর পাশে থাকতেন, রাজচন্দ্রও সেরকম রাণীর কথা কোনদিন অবহেলা করেননি। এজন্য যত অর্থব্যয়ই হোক রাজচন্দ্র পশ্চাৎপদ হতেন না।

আধুনিক সময়ে আমরা বলি আমাদের মহিলারা নাকি সুশিক্ষিত হয়েছেন, তাঁরা নাকি অগ্রসর। কিন্তু আজকের জগতে রাণী রাসমণির সমকক্ষতা তো দূরের কথা, সামান্যতম ভগ্নাংশ পেলেও আজ অনেক সামস্যাই দূর হতো।

শুনি মহিলারা আজকাল বাইরে কাজ করেন,—তাই ভিতর তাঁরা সুষ্ঠুভাবে দেখবার সময় পান না।

রাসমণির জীবনধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে একথার বিশেষ কোন মূল্য নাই। রাণী একহাতে জমিদারী চালিয়েছেন, ব্যবসা চালিয়েছেন, প্রজা শাসন করেছেন, পাওনা আদায় করেছেন, দুষ্টের শাসন করেছেন, আবার নিখুঁতভাবে নিজের হাতে গৃহকর্ম, দেবসেবা, অতিথি অভ্যাগতের আপ্যায়ণ, উৎসব অনুষ্ঠান—সবই করেছেন।

আমরা পাশ্চাত্য নারী সমাজের কর্মশক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এমন নাকি আর হয় না। কিন্তু রাণীর জীবন আমাদের অন্য সাক্ষ্য দেয়।

আজ আমাদের এই সামাজিক অরাজকতার মধ্যে রাসমণির প্রয়োজন। লঘু ডানায় ভর করা মহিলাদের সামনে আজ আদর্শের প্রয়োজন।—ভারতের মাটিতেই রাণী রাসমণি, রাণী ভবানী জন্মগ্রহণ করতে পারেন। অন্য কোথাও নয়। আমাদের দেশের মেয়েরাও এই ভারতের মাটিরই জীবন্ত প্রতিমা। সাময়িক বিভ্রান্তি, পশ্চিম গগনের লোহিত আলোকে দিকভ্রান্ত। কিন্তু তাঁদের মধ্যেই আবার রাসমণি আসবেন, এই ভ্রান্তি কেটে যাবে।

শুধু মহিলারাই নয়, আমাদের দেশের পুরুষ সমাজেরও রাণীর জীবনালোক থেকে অনুকরণ করবার অনেক কিছু আছে।

জীবন সংগ্রামে যে তেজ, যে তীক্ষ্ণ ও কূট বুদ্ধির প্রয়োজন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোসহীনতা, আবার শরণাগতের প্রতি কোমল ব্যবহার—আমাদের দেশে তার প্রয়োজন আছে। কি নারী কি পুরুষ এই উভয় দলই আজ দিকভ্রান্ত। পুরুষের মেরুদণ্ড আজ বক্র, মেয়েরা আজ হাল্কা স্বপ্নে নিমজ্জিত।

আজ দেশে রাসমণির প্রয়োজন—তিনি অসবেন—তিনি আসছেন।

৺শান্তি—৺শান্তি—৺শান্তি
